ভিখারী দর্পন

PEOPLE'S PARTICIPATION

another world is possible

2005

another world is possible

ভিখারী দর্পন

প্রকাশক ঃ
* People’s Participation

প্রথম সংস্করণ ঃ
২০১৩ সাল

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ
জানুয়ারী, ২০২১ সাল

তৃতীয় সংস্করণ ঃ
মার্চ, ২০২২ সাল

প্রচ্ছদ ঃ
দীপঙ্কর মিত্র

কপিরাইট ঃ
People’s Participation

অনুদান মূল্য ঃ ২০১/- মাত্র

ভুমিকা

আমরা একটি সমাজসেবামূলক সংস্থা যা গত ১৫ বৎসর যাবৎ গরীব ও বঞ্চিত মানুষদের অধিকার বিষয়ে কথা বলে চলেছি। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে প্রতিদিন সাধারণ মানুষের জীবনের মান নীচে নেমে যাচ্ছে। সমাজে নতুন করে শ্রেনীবিন্যাস তৈরী হয়েছে। অনেক মানুষ ''দিন আনা দিন খাওয়া'' শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে। এই অবস্থায় ভিক্ষাবৃত্তি ও যৌনপেশা একটি অতি সাধারণ পেশাতে পরিণত হয়েছে।

বর্তমানে বিশ্ব উদরনীতিবাদের ফলে গরীবদের সংখ্যা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাবে। মানুষ আরো অনৈতিক পথে উপার্জন করতে চাইবে, ভোগবাদ চরম আকার ধারণ করবে এবং 'সরকার' পুঁজিবাদের ধারক ও বাহক হয়ে উঠবে।

ভিক্ষাবৃত্তি একটি অতি পুরোনো ও পরিচিত পেশা। প্রতিটি ধর্মে ভিক্ষাবৃত্তিকে গৌরবান্বিত করা হয়েছে। ভিক্ষা দেওয়াকে একটি ধর্মীয় পূর্ণ্য লাভের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়। আবার অপরদিকে বিভিন্ন মানুষ ও কিছু সংস্থা ভিখারীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মিথ্যা ও ভুল তথ্য প্রচার করে চলেছেন। তাদের ধারণা এই ভাবে একটি ভিখারী মুক্ত সমাজ সৃষ্টি করা সম্ভব।

People's Participation (পিপলস পার্টিশিপেশন) ভিখারীদের সম্বন্ধে গত ১৭ বৎসর যাবৎ কাজ করে চলেছে। এর আগে ২০১৩ সালে ভিখারীদের সম্বন্ধে প্রথম বই প্রকাশিত হয়। এই বইটি প্রকাশ করার আগে আমরা ভিখারীদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক উন্নতিসাধন করতে গিয়ে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করি যা এই বই-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে সরকারী হিসেবে সব থেকে বেশি ভিখারীর স্থান পশ্চিমবঙ্গে। এর সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে যুক্ত। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার ভিখারীদের নিয়ে বিভিন্ন প্রকল্প তৈরীর চিন্তা করছেন। কিন্তু উক্ত প্রকল্পগুলিতে অসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির সঙ্গে কোনো রকম পরামর্শ করা হয় নি।

বর্তমান ভারতে কিছু রাজ্যে ইংরেজ শাসনকালে কিছু ভিক্ষাবৃত্তি নিবারণ আইন তৈরি হলেও স্বাধীনতার পরে আজ পর্যন্ত কোনো কেন্দ্রীয় আইন তৈরি করা সম্ভব হয়নি।

কিছু কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ভিক্ষাবৃত্তি নিবারণ নিয়ে কিছু কাজ করে চলেছেন। সামাজিক চাপে কিছু রাজ্য সরকার কেন্দ্রের সহযোগিতায় স্বল্পমূল্যে রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে অতি গরীব ও প্রান্তিক মানুষদের মধ্যে খাদ্যদ্রব্য বিলি বন্টন করে ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তারা কখনোই প্রকৃত ভিখারী নিয়ে চিন্তা করেননি এবং তাদের প্রকৃত অবস্থা পর্যালোচনা করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

আমরা বিভিন্ন মানুষের কিছু মনগড়া কাহিনীর মাধ্যমে ভিক্ষাবৃত্তি সম্বন্ধে অনেক ভুল তথ্য গ্রহন করে থাকি।

এই বইতে উল্লিখিত বিভিন্ন সত্যঘটনা সম্বন্ধে আপনি ভিখারীদের বিষয়ে জানতে পারবেন এবং একটি ভিখারি মুক্ত সমাজ গঠনে আমাদের ও সরকারের কি ভূমিকা হওয়া উচিত সেই বিষয়ে মতামত জানাতে পারবেন।

নমস্কারান্তে ঃ দীপঙ্কর মিত্র, শমিতা গোস্বামী
(People's Participation)
(মার্চ, ২০২২)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

কোন কাজ সম্পাদন করার অবশ্য প্রয়োজনীয় শর্ত হল একাধিক ব্যক্তির কর্মপ্রচেষ্টা এবং এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আমি ধন্যবাদ জানাই 'মমপাপা ফাউন্ডেশন' এবং 'কালিশঙ্কর ফাউন্ডেশন' - কে যাদের ধৈর্য ও সহযোগিতা এই কাজটি করতে সাহায্য করেছিল। আমি ধন্যবাদ দিই আমার বন্ধুদের যাদের পরিশ্রমী কর্মপ্রচেষ্টা এই গ্রন্থের প্রকাশকে সম্ভব করে তুলেছে।

গ্রন্থে উল্লিখিত বিভিন্ন উদাহরণ, ক্ষুদ্র সত্য কাহিনী ইত্যাদির উৎস হল বিভিন্ন খবরের কাগজ, ওয়েবসাইট, সাময়িকপত্র, যোগদানকারী বিভিন্ন বক্তা ও ভিখারীদের বক্তব্য যা সংগ্রহ করা হয়েছে দীর্ঘ ১০ বৎসর ধরে। দুর্ভাগ্যবশত অনেক উৎস সবসময় চিহ্নিত ছিল না, ফলত তার উপযুক্ত স্বীকারক্তি দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই তাদেরকে যারা এই কাজে অংশগ্রহণ করেছে, এমনকি অনামা ভিখারিদেরকেও। যদি অজ্ঞানবশতঃ কারোর অবদান স্বীকৃতি না দিয়ে থাকি তাহলে পরবর্তী প্রকাশে নিশ্চিত তাদের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে।

নমস্কার সহ
দীপঙ্কর মিত্র
(পিপলস পার্টিশিপেশন)
মার্চ-২০২২

जय हिन्द दया धर्म का मुल है पाप मुल अभिमान । जय हिन्द
तुलसी दया न छोडिये जब तक कंट में प्राण ।।

प्यारे भाईयों और बहनों,

मैं बहुत गरीब और अनाथ हुँ । मेरे तीन बहन और दो भाई हैं । बडा भाई अन्धा, दो बहन गुंगी और एक बहन लंगरी हैं । इन सभी का भार मेरे उपर हैं। में आपसे विनती करता हुँ कि 2रु, 5रु, 10रु, 50रु, और 100रु जो भी आप से बन सके गरीब की मदद करें । यह आदमी नागपुर का रहनेवाला हैं ।

बनती है किस्मत तो बुराए नही जाती।
बिगडती है किस्मत ता बनाई नही जाती ।।

कागज पढकर वापस कर दें ।

کرو مہربانی تم زمین پر خدا مہرباں ہوگا عرش بریں پر

پیارے بھائیوں اور بہنوں!

میں ایک بہت غریب اور یتیم آدمی ہوں۔ میری تین بہنیں اور دو بھائی ہیں۔ دو بہنیں گونگی اور لنگڑی ہیں۔ بڑا بھائی اندھا ہے اور ان چاروں کی ذمہ داریاں میرے اوپر ہیں۔ اس لئے آپ سے گذارش ہے کہ ۲، ۵، ۱۰، ۵۰، ۱۰۰ روپے جو بھی آپ سے بن سکے مدد کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ پڑھ کر یہ کاغذ واپس کر دیں۔

দয়া ধর্মের মুল পাপ অভিমান
তুলসী দয়া না ছাড়িও শরীরে থাকে প্রান

প্রিয় ভাই ও ভগ্নীরা,

আমি এক অনাথ, আমার তিন বোন ও .....
দুই ভাই আছে। দুই বোন বোবা ও এক বোন খোঁড়া, বড় ভাই অন্ধ। ইহারা সকলেই আমার উপর নির্ভর।

অতএব আপনাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ

পাখী নদীর জল পান করিলে যেমন জল কমে না।
সেই রূপে গরিবকে দান করিলে ধন কমে যায় না।।

Dear Brother & Sister,

I am a poor man, I have three Sister & two Brother, Elder Brother is blind and younger two have no Toung. All are dependant me. Hence, I pary help form you Rs. 2/-, Rs. 5/-, Rs. 10, Rs. 50/-,

ভিক্ষাবৃত্তি ঃ ভিখারি বা ভিক্ষা কথাটা শুনলেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠবে এক শ্রেণীর মানুষগুলোর চেহারা যারা আর্তকণ্ঠে অন্যের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে হাত পেতে আছে— দাবি অর্থ বা খাবার। যে মানুষটা সাহায্য চাইছে তার কি বাঁচার সম্ভাব্য সবগুলো উপায় বন্ধ হয়ে গেছে? উত্তর অবশ্যই ''না''। বেশির ভাগ ভিখারী তাদের ভিক্ষাবৃত্তি পেশা হিসাবে সানন্দে গ্রহন করেছে। অতএব ভিক্ষাবৃত্তি একটি লাভজনক পেশা — যে পেশায় নূন্যতম বিনিয়োগ নেই, পরিশ্রম নেই। শুধু নাটক বা ড্রামাটা ঠিকঠাক করতে পারলেনই কেল্লা ফতে। এই আয়করবিহীন উপায় হিসাবে ''ভিক্ষাবৃত্তি'' রাষ্ট্রীয় ভাবে আইন প্রনয়ণ করে বন্ধ করে দেওয়া উচিত, অবিলম্বেই, ''ভিক্ষাবৃত্তি হচ্ছে ক্ষতস্বরূপ; এর দ্বারা মানুষ তার মুখমন্ডল ক্ষতবিক্ষত করে। ''বৈদিক যুগে বা তারও পরবর্তী সময়ে সমগ্র ব্রাহ্মণগণ ''ভিক্ষাং দেহি'' হলে গৃহস্থের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বাজখাঁই কণ্ঠে চিৎকার পাড়ত। এরপর পান থেকে চুন খসলেই অভিশাপ অভিসম্পাত। এখন আর কোনো ব্রাহ্মন-ব্যক্তি পরিচয়ে ভিক্ষা প্রার্থনা করেন না। তার কারণ পেশার পরিবর্তন। ব্রাহ্মণগণ বিলক্ষণ বুঝলেন ভিক্ষাবৃত্তি এখন আর সম্মানের বিষয় নয়, বরং ঘৃণার বিষয়। ব্রাহ্মণগণ ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়লেও বৃহৎ অব্রাহ্মণগণ ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণগণের পরিত্যক্ত পেশাকে আকড়ে ধরলেন রোজগারের পথ হিসাবে। আসুন তো এই বৃত্তিটাকে একটু তলিয়ে দেখি। দেখি এই আমাদের নজরে আসা ভিখারিরাই কি সত্যিকারের ভিখারী, নাকি এই ভিক্ষাবৃত্তিটা একটা সামাজিক অভিশাপ।

ভিক্ষাবৃত্তির কী কোনো অবসান হবে না! কোনো উপায় কি নেই ? অবশ্যই আছে। অভাব শুধূ মানসিকতার এবং উদ্যোগের। আমাদের সমাজে ভিখারি এবং ভিক্ষাবৃত্তিকে জিইয়ে রেখেছেন দুই শ্রেণীর মানুষ। একদল মানুষ আরেকদল মানুষকে করুণা করে নিজেরা আত্মতৃপ্তিতে ভোগার সুযোগ হারাতে রাজি নন। আর একদল পুণ্যলোভী, এরা মনে করে ভিখারীকে ভিক্ষা দিয়ে সারাজীবনের পাপ-ক্লেদ ধুয়ে মুছে ফেলতে পারবো। সেইজন্য এরা দেখবেন ভিখারিদের দেওয়ার জন্য কিছু পয়সা অগ্রিম বাজেটে রাখে। মন্দির-মসজিদগুলোতে দেখবেন লাইন দিয়ে বসে থাকা ভিখারিদের লাইন দিয়ে ভিক্ষে দিয়ে চলেছেন অনেক ব্যক্তি। দান আর ভিক্ষা এক কথা নয় এটা বুঝে নেওয়া দরকার।" আমায় কিছু সাহায্য করুন, ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন"— সব ভিখারিই ধার্মিক হয়! তাই ধর্মের নামে ভিক্ষা করে। কেউ আল্লাহর বান্দা, কেউ ভগবানের দাস। হিন্দুধর্মে ভিক্ষাবৃত্তি নিষিদ্ধ না হলেও ইসলাম ধর্মে কিন্তু নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ কী সেটা বড়ো কথা নয়— তা সত্ত্বেও পৃথিবী জুড়ে ভিখারী আর ভিক্ষাবৃত্তির ছয়লাপ। বড়ো বড়ো রেল স্টেশন, সাব টার্মিনাল, মন্দির-মসজিদ বা যেখানে লোক্ সমাগম বেশি সেখানে এদের উপস্থিতি আমাদের সবারই নজরে পরে প্রতিনিয়তই। ছোটো ছোটো শিশু, অস্থিচর্মসার বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, রুগ্ন মহিলা এবং শারীরিক অক্ষম মানুষগুলোর ভিক্ষের জন্য করুন আর্তিতে বেদনাহত হয়ে বা অনেক সময় পূণ্যলাভের আশায় আমরা কিছু সাহায্য করি। কিন্তু আমরা যেটা অনেকেই জানি না যে ওই ভিক্ষার অর্থ যা আমরা ভিখারিটির হাতে তুলে দিলাম তাতে হয়তো তার কোনোই অধিকার নেই।

মূলত ভিক্ষাবৃত্তি একটা মানসিক অবস্থা (সাইকোলজিক্যাল স্টেপ)... যেখানে আত্মসম্মান আর আর্ত্মমর্যাদাবোধ কাজ করে না। নিজের সম্পদ আর সাধ্যের মধ্যেই নিজেদের ব্যবস্থাপনাকে নিশ্চিত করে।

ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বের হওয়ার পথ আছে। সবচেয়ে আগে দরকার আত্মসম্মান আর আত্মমর্যাদা বোধের উন্মেষ। যেমন নিজেকে মানুষ হিসাবে সম্মান করার আর তেমনই আর একজন মানুষের দিকে হাত প্রসারিত করে নিজেকে অসম্মানিত হতে দেব না। ঠিক তেমনই সামাজিকভাবেও নিজেরা সচেতন থেকে ভিক্ষার মাধ্যমে কোনো অগৌরবের সৌধ না বানিয়ে-নিজেদের সাধ্যের মধ্যেই নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখা।

গ্রামে-গঞ্জে, রাস্তাঘাটে, অফিসে-যানবাহনে ভিখারিদের উপদ্রব ক্রমশ বেড়েই চলেছে। অনেক সময় তারা প্রায় পথরোধ করে ভিক্ষা দাবি করে পথচারীদের বিব্রত করে থাকে। কিছু ভিখারি নিশ্চিত ভিক্ষালাভের কৌশল হিসাবে নিজেদের বিকলাঙ্গ ও বিকৃত চেহারা দেখিয়ে রাস্তাঘাটে ভীতিকর পরিবেশ তৈরি করে ভিক্ষা তথা মুদ্রা সংগ্রহ করে। অনেকেই শিশুদের নিয়োজিত করে। করুন পরিস্থিতি তৈরি করতে দুগ্ধ পোষ্য শিশুকে ভাড়ায় নেওয়া হয়। ভিক্ষাবৃত্তি একটি সামাজিক সমস্যা। দরিদ্রতা এর অন্যতম কারণ। দরিদ্রতার কষাঘাতে পিষ্ট হয়ে বেঁচে থাকার তাগিদে অনেকেই ভিক্ষা করতে বাধ্য হয়। এই পথেই দরিদ্র ভিখারিরা সচ্ছল ভিখারী হয়ে ওঠে। লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যাংক-ব্যালেন্স হয়। অর্থ-উপার্জনের সহজ পথ হিসাবে ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসাবে বেছে নেয়। অথচ ভিক্ষাবৃত্তি মানবতার চরম অবমাননা। এটা স্বীকৃত বা সম্মানজনক কোনো পেশা নয়। তবু পৃথিবীর প্রায় সব দেশের মধ্যেই ভিক্ষাবৃত্তির প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তবে তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলিতে ভিখারীর সংখ্যা ও তৎপরতা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। কতিপয় মানুষ ''প্রকৃতই'' শারীরিক অক্ষমতার কারণে, অশক্ত বয়স্ক মানুষ ও কর্মশক্তিহীন দরিদ্র মানুষ প্রয়োজনীয় সামাজিক সহযোগিতা না পেয়ে বা অন্য কোনো কাজ করতে পারার দক্ষতা না-থাকায় বাধ্য হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহন করে থাকে। বেশিরভাগ ভিখারিই কর্মক্ষম। কাজ করতে বললে বা কাজ দিতে চাইলে তারা বিরক্ত প্রকাশ করে ভিক্ষা না নিয়েই চলে যাবে। তারা মূলত অলস ও কর্মবিমুখ।

মহিলা ভিখারীদের অনেক সময় দেখা যায় কোলে বাচ্ছা নিয়ে, তাতে দাতার মন ভেজাতে সুবিধে হয়। এই বাচ্ছাগুলো তাদের নিজেদের নাও হতে পারে, চুরি করা বা ভাড়া করা। ভিক্ষাবৃত্তি যুগে যুগে অবহেলিত ও ঘৃণিত হলেও এই পেশাকে উন্নত কিংবা উন্নয়নশীল দেশ থেকে বিতাড়িত করা সম্ভব হচ্ছে না, মানুষ হিসাবে তাদেরও বেঁচে থাকার অধিকার আছে। অধিকার আছে খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান, চিকিৎসার অধিকার ভোগ করার। কিন্তু দারিদ্র্যের কারণে তারা এসব মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। এ বঞ্চনার দায় সরকার ও সমাজের বিত্তশালীরা এড়াতে পারে না। যে সমাজে ভিক্ষুক থাকে, সে সমাজের বিত্তশালীরা সম্মানিত হতে পারে না। অপরদিকে ভিখারী জনগোষ্ঠীর ভোটে নির্বাচিত শাসকরাও তো গর্ববোধ করতে পারে না। যিনি ভিখারিদের প্রতিনিধিত্ব করেন তিনি আর যাই-ই হোক সমাজের ভালো চান না। তাই মর্যাদাপূর্ণ সমাজ ও দেশ গড়তে হলে ভিক্ষাবৃত্তি দূর করা অপরিহার্য।

''আর ভিক্ষা নয়, কেবল পুর্নবাসন চাও''। আসুন, একটা ভিখারিমুক্ত দেশ গড়ি। ভিখারীকে ভিক্ষা দিয়ে সমাজকে পঙ্গু করার দায়িত্ব আপনি কেন নেবেন?

———————— ইউকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে————————————

আমরা কে ?

People's Participation একটি মানবাধিকার সংস্থা যারা দক্ষিণেশ্বর ও আদ্যাপীঠ মন্দির সংলগ্ন অঞ্চলে ভিখারীদের আর্থসামাজিক উন্নতিতে অংশগ্রহণ করেছে।

অন্যান্য রাজ্য এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আর্থ সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া সমাজের বঞ্চিত মানুষেরা খাদ্যের সন্ধানে বাঁচার তাগিদে শহরমুখি।

প্রথাগত ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার অভাব এই মানুষজনদের শহরে বসবাস করার যোগ্যতা দেয় না। সার্বিকভাবে পিছিয়ে পড়া এই মানুষজন তখন বাধ্য হয়ে ভিক্ষাবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করে।

আমাদের দেশে ব্রিটিশ আমলে তৈরী করা বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে ভিক্ষাবৃত্তিকে দন্ডনীয় অপরাধ হিসাবে গণ্য করে তাদের জন্য সারা ভারতবর্ষে জেলখানার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত জেলখানাগুলি যথেষ্ট পরিমার্জিত হয়ে ভিখারী সংশোধনাগারে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু এই সংশোধনাগারগুলির অপ্রতুলতা বারবার চোখে পড়ে। বর্তমানে সরকারী ব্যবস্থাপনায় সৃষ্ট ভবঘুরেদের আবাসের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। যেখানে উক্ত ভিখারীরা প্রয়োজনে নিঃখরচায় থাকতে পারবেন।

এছাড়াও, আপনারা ১০৯৮-এ ফোন করে কোন অসহায় বাচ্চার সম্বন্ধে খবর দিলে উক্ত সংগঠনের কর্মীগণ যথাসাধ্য সাহায্য করবেন এই বাচ্চার সাহায্যার্থে। Child Welfare Committee-র ভূমিকাও এই ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ। Controller of Vagrancy অথবা চক্রচর নিয়ামক সংস্থা হল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজ কল্যাণ বিভাগের অন্তর্গত একটি সরকারী সংস্থা যারা বার্ধক্যভাতা - বিধবাভাতা-প্রতিবন্ধী ভাতার ব্যবস্থা করে থাকেন। সরকারী বৃদ্ধাবাসের ব্যবস্থা করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজ কল্যাণ বিভাগ। বর্তমানে শিক্ষার অধিকার আইন সারা ভারতবর্ষে বলবৎ হওয়ায় বিনা পয়সায় সরকারী বিদ্যালয়ে গরীব বাচ্চাদের পড়াশোনার বন্দোবস্ত করা গেছে। শোনা যায়, ভিখারী মাফিয়াদের সম্বন্ধে অনেক কথা। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এই ধরনের মাফিয়ার বিষয়ে আমরা খবর পাইনি।

ভিখারী শূন্য সমাজ একটি অলীক কল্পনা। সারা পৃথিবীতে প্রতিটি দেশে ভিখারী দেখা যায়। বিভিন্ন দেশ তার ভিখারী নাগরিকদের প্রতিরোধ করার জন্য ভিক্ষাবৃত্তির উপরে বিভিন্ন আইন বলবৎ করেছেন। কিন্তু বর্তমানে বিশ্বায়নের কু-প্রভাবে এই সম্প্রদায়ের উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি ঘটে চলেছে। এই ক্ষেত্রে, একটি সুন্দর-গঠন মূলক ও সম্মানজনক শর্তে বিশ্ব সমাজ গঠনে ভিখারীদের সম্বন্ধে সঠিক চিন্তা শুরু করা দরকার। ভারতের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার ভিক্ষাবৃত্তি নিবারণে এগিয়ে এসেছেন। কিন্তু সমাজের বাকী অংশের মানুষেরা এখনও ভিখারীদের সম্বন্ধে বিভিন্ন কারণে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নন।

আসুন সকলে মিলে ভিখারী মুক্ত সমাজ গঠনে অংশগ্রহণ করি। ভিক্ষাবৃত্তি কোন শখ্ নয়, সম্পূর্ণ ভাবে একটি পেশা যা গরীব-অসহায় দূর্বল ও আর্থসামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষের জীবিকার সন্ধান দেয়। দেখা যায়, সাধারণ ক্ষেত্রে একজন ভিখারীর সারা দিনের 'ভিক্ষা' ৫০ থেকে ৫০০টাকা পর্যন্তও হয়। যা বর্তমান ভারতের সাধারণ মানুষের দৈনিক আয়ের থেকে খুব কম নয়।

পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি ধর্মেই ভিক্ষাবৃত্তিকে গরীমালিপ্ত করা হয়েছে এবং ভিক্ষা-দানকে পূর্ণার্জন বলে গণ্য করা হয়। অনেক মানুষ এখনও তাদের পারিবারিক অনুষ্ঠানে ভিখারীদের নিমন্ত্রণ করেন। 'কাঙালী ভোজন' আমাদের সমাজে একটি অতি প্রচলিত শব্দ। এর মাধ্যমে মানুষ তার দানের মাধ্যমে পূণ্য খুঁজে পান।

বিভিন্ন ধরণের ভিখারী দেখতে পাওয়া যায়। শারীরীক ও মানসিক প্রতিবন্ধী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বাচ্চা, ধর্মীয় ভিখারী,

যেমন-বোষ্টম, পীর-ফকির, সাধু-সন্ন্যাসী প্রভৃতি। এছাড়াও গ্রাম ও শহরের ভিখারীদের মধ্যে আয়ের তারতম্য দেখা যায়।

People's Participation দক্ষিণেশ্বর মন্দির সংলগ্ন অঞ্চলে ভিখারীদের মধ্যে সামাজিক উন্নতি ও তাদের চেতনা বৃদ্ধিতে কাজ করে চলেছে যা ভবিষ্যতে ঐ ভিখারীদের বাচ্চাদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। এছাড়া সরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বাচ্চা-মহিলা ও পুরুষদের জন্য আবাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই আবাসে এদের জন্য সর্বসুবিধা থাকলেও খাবারের বন্দোবস্ত এখনও করা সম্ভব হয়নি। এইসব বাচ্চারা গঙ্গা থেকে চৌম্বক এর সাহায্যে ভাটার সময় পয়সা তোলে ও ভিক্ষা করে। Counseling-Story telling -Life skill education এর মাধ্যমে এইসব ভিখারীদের প্রতিদিন ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করা এবং সরকারী ও অ-সরকারী দপ্তর থেকে তৈরী করা সুযোগ সুবিধার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কাজ চলেছে। আমরা আশা করি এদের বাচ্চারা ভবিষ্যতে ভিক্ষাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করবে না। সাধারণ জনগণকে এই ব্যাপারে ওয়াকিবহাল করতে পথনাটিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

ভিখারীমুক্ত সমাজ সোনার পাথর বাটির মতো কাল্পনিক চিন্তা। কিন্তু People's Participation এক্ষেত্রে উক্ত কল্পনাকে বাস্তব রূপদান করতে সরকার ও বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে হাতে হাতে মিলিয়ে কাজ করে চলেছে।

আপনার সাহায্য প্রার্থনীয়।

আপনার আর্থিক সাহায্য 80G ধারায় আয়কর ছাড়যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

PEOPLE'S PARTICIPATION

Email - peoplesparticipation@gmail.com, **Mob. : 9339126219**

স্মরণীয় বাণী

কহিল ভিক্ষার ঝুলি টাকার থলিরে

আমরা কুটুম্ব দোঁহে ভুলে গেলি কীরে?

থলি বলে কুটুম্বিতা তুমিও ভুলিতে

আমরা যা আছে গেলে তোমার ঝুলিতে।

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দানপ্রবণতা

সংকেত মুখার্জ্জী

অভাবগ্রস্থকে সাহায্য করার এক স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যাস বিলের মধ্যে দেখা গিয়েছিল। ভ্রাম্যমান সাধু-সন্তের প্রতি তাঁর এক বিশেষ আকর্ষন ছিল। একদিন তিনি এক ফকিরকে নতুন একটা কাপড় দিয়েছিলেন এবং সে তা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করল। কিন্তু এই রকম একটা ঝকঝকে পোষাক দান করা দেখে পথচারীরা চমকে উঠে সেই ফকিরকে ভর্ৎসনা করতে লাগল। তাই দেখে মাত্র চার বছরের বালক বিলে চট করে তাদের বললেন— ''ওকে বকছ কেন? ওর ভিক্ষে চাইবার অধিকার আছে। অভাবীকে সাহায্য করা উচিৎ।'' এইভাবে জিনিস বিলিয়ে দেওয়া বন্ধ করতে মাঝে মাঝেই বিলেকে ঘরে তালা বন্ধ করে রাখতে হত। কিন্তু এত করেও পার পাওয়া যেত না। ঘরের মধ্যে হাতের নাগালে সে যা পেত, সে সবই জানালা গলিয়ে বাইরে ফেলে দিত।

সরকার ও ভিখারী

কালীশংকর ফাউন্ডেশন

কলকাতার ভিখারিদের পুর্নবাসনের জন্য কেন্দ্রীয় প্রকল্পকে ঘিরে সন্দেহের মেঘ রাজ্যে। তাই নিয়ে দোটানায় শাসক দল। ভিখারিদের পাশে দাঁড়াতে দেশের বড় বড় শহরে নতুন প্রকল্প হাতে নিয়েছে কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় মন্ত্রক। তারই অঙ্গ হিসেবে শহরের ভিখারিদের নিখরচায় খাবারের ব্যবস্থা করতে ফিডিং সেন্টার চালু করা, ভিখারি চিহ্নিতকরণ, তাদের জন্য বাসস্থান নির্মান এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

যে সব ভিখারিরা ফুটপাতে বসবাস করে তাদের জন্য কলকাতা শহরে অনেকগুলি আরবান শেল্টার বানানো হয়েছে। কিছু ভিখারি আছে যারা সব পরিযায়ী ভিখারি। তাদের বিষয়ে পুরসভার কাছে কোনও তথ্য নেই। কলকাতা শহরে ভিখারিদের সঠিক সংখ্যা জানার জন্য সমীক্ষা করানো হবে।

কেন্দ্রীয় প্রকল্প অনুযায়ী, প্রথম পর্যায়ে দেশের মোট ১০টি শহরকে ভিখারিমুক্ত করা হবে। এই তালিকায় রয়েছে রাজধানী দিল্লি ও মুম্বই, কলকাতা, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, নাগপুর, পাটনা, লখনউ এবং ইন্দোর। এর জন্য স্থানীয় পুরসভাগুলিকে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করতে বলা হয়েছে। এই প্রকল্পে যে অর্থ খরচ হবে তার ৬০ শতাংশ দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। বাকিটা দিতে হবে রাজ্যকে। সেই মতো হায়দরাবাদ পাটনা এবং ইন্দোর শহরের ভিক্ষাবৃত্তি নির্মূলকরণ পরিকল্পনার খসড়া রিপোর্ট কেন্দ্রের কাছে ইতিমধ্যেই জমা পড়েছে। তার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ বরাদ্দ করেছে। কিন্তু বাকিদের কাছ থেকে এখনও সাড়া মেলেনি।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে শহরের ভিখারিদের সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে সমীক্ষা চালানো হবে। তারা যাতে নিখরচায় দু'বেলা খেতে পায় তার জন্য শহরেরর বিভিন্ন প্রান্তে ফিডিং সেন্টারে খোলা হবে। তাদেরকে কোনও সরকারি শেল্টার বা রেসকিউ সেন্টারে রাখা হবে। দেওয়া হবে কারিগরি প্রশিক্ষণ। এরপর তাদেরকে বিভিন্ন পদে নিযুক্ত করা হবে। সরকারি স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা করা হবে কম বয়সি ভিক্ষুকদের। তাদের জন্য টিউশনের ব্যবস্থা করবে প্রশাসন।

ভিক্ষাবৃত্তি বিলোপ প্রকল্প

● ভিখারি চিহ্নিত করতে সমীক্ষা ● স্থায়ী বাসস্থান ● ফিডিং সেন্টার ● শিশু ভিক্ষুকদের স্কুলে ভর্তি ● কারিগরি প্রশিক্ষণ ● কর্মসংস্থান ● খরচের ৬০ শতাংশ কেন্দ্র, ৪০ শতাংশ রাজ্য।

''২০১১ সালের আদমসুমারি অনুসারে ৪১ লক্ষ তিন হাজার ৬৭০ জন ভিখারি রয়েছে। যাদের মধ্যে ২১ লক্ষ এক হাজার ৬৭৩ জন পুরুষ। শেষ তিন বছরের কোনও হিসেব এখনও পাওয়া যায়নি। তাই সেই বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা যাবে না।'' উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায়বিচার এবং দক্ষতা মন্ত্রকের পক্ষ থেকে পেশ করা ২০১১ সালের জনগণনা রিপোর্ট অনুসারে দেশের মধ্যে সবথেকে বেশি ভিখারি রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। আরও চাঞ্চল্যকর বিষয় হচ্ছে এই রাজ্যের মোট ৮১ হাজার ২৪৪ জন ভিখারির মধ্যে ৪৮ হাজার ১৪৮ জনই হচ্ছে মহিলা। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের মোট ভিখারির মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগের বেশিই হচ্ছে মহিলা। দেশে এমন অনেক ভিখারি রয়েছে যাদের কাজ করার কোনও ক্ষমতা নেই। শারীরিকভাবে বিকলাঙ্গ হওয়ার কারণে ভিক্ষা করা ছাড়া কোনও পথ তাদের সামনে খোলা নেই।

''দেশের ২০টি রাজ্য এবং দুটি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে ভিক্ষা বৃত্তি রুখতে পৃথক আইন রয়েছে।''

ঃ নিউজপেপার থেকে সংগৃহীত ঃ

মৃত ভিখারির ঘর থেকে মিলল ১.৫ লক্ষ টাকার কয়েন, জমানো ৮ লক্ষ টাকা। দক্ষিণ-পূর্ব মুম্বইয়ের গোবান্দি এলাকায় বস্তিতে একা থাকতেন ওই ভিখারি । মৃত ভিখারির ঘর থেকে লক্ষাধিক টাকা পেল পুলিশ। দুর্ঘটনায় মৃত মুম্বাইয়ের এক ভিখারির বাড়ি থেকে ফিক্সড ডিপোজিটে জমানো ৮.৭৭ লক্ষ টাকা, ১.৫ লক্ষ টাকার কয়েন পাওয়া গিয়েছে, সঙ্গে বেশ কয়েকটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও পাওয়া গিয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। মৃত ভিখারি বিরজু চন্দ্র আজাদের জীর্ণ ঘরে হানা দেয় পুলিশ, সেখানে গিয়েই চক্ষু চড়কগাছ হয় পুলিশের। ঘরে থাকা স্তুপাকার কয়েন গুনতে কয়েক ঘন্টা লেগে যায় পুলিশকর্মীদের। শেষ পর্যন্ত তাঁরা দেখেন, কয়েনেই ভিখারির সঞ্চয় দেড় লক্ষ টাকা। দক্ষিণ-পূর্ব মুম্বইয়ের গোবান্দি এলাকায় স্বস্তিতে একা থাকতেন ওই ভিখারি।

পুলিশ জানিয়েছে, তাঁর সঙ্গে ছিল একটি ভোটার পরিচয়পত্র, প্যানকার্ড এবং আধারকার্ড। ঘরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল পুরানো খবরের কাগজ এবং পলিথিন ব্যাগ। এক পদস্থ পুলিশকর্তা জানান, ''গোবান্দি এবং মানখুর্দের মধ্যে রেললাইন পার হওয়ার সময়, দূঘটনায় মৃত্যু হয় বিরন্দু চন্দ্র আজাদের।

পাগল খুঁজে ঘরে নিয়ে যান মোসলেম

নিউজপেপার থেকে সংগৃহীত

সুকান্ত সরকার ● নাকাশিপাড়া

গলায়দড়িতে কোনও পাগল মরে না। বরং চাঙ্গা হয়ে ওঠে। কারণ, নদিয়ার নাকাশিপাড়ার গলায়দড়ি গ্রামে আছে মোসলেম মুন্সি। পাগল দেখলেই তিনি কানে কানে বলবেন, 'ভয় কী রে পাগল, আমি তো আছি।'

নিজের ভালো পাগলেও বোঝে। মোসলেম বোঝেন শুধু পাগলের ভাল। রাস্তার ধারে, গঞ্জের হাটে যারা 'সাপ-লুডো খেলছে বিধাতার সঙ্গে,' মোসলেম তাদের পাকড়াও করেন। বাবা-বাছা করে বাড়িতে এনে সাবান দিয়ে গরম জলে স্নান করান, তার পর দিনের পর দিন যত্নআত্তি করে পাগলের মতি ফেরান। স্নেহ মমতায় যদি ভাল হয় তো ভাল, না হলে পাগলকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে ছোটেন। ওষুধপত্র ও নিজেই কিনে দেন। এতে যদি কেউ মোসলেমকেই পাগল ঠাওরান, কুছ পরোয়া নেহি। তিনি তো ২২ পাগলের মুক্তিদাতা!

মোসলেমের বাড়িটি কাঁচাপাকা। দোতলায় একটি ছোট্ট ঘর। সেই ঘরেই পাগল থাকে। পাগল না থাকলে মোসলেম নিজেই থাকেন। মোসলেমের গারদে বেশী পাগল থাকে না। কারণ, দাঙ্গা-হাঙ্গামার ভয় আছে, কোরাসে গগন-বিদারী চিৎকার আছে, পড়শিদের হাতে মার খাওয়ার ভয় আছে। বাড়িতে অষ্টপ্রহর পাগল। স্ত্রী কিছু বলেন না? ছেলেমেয়েরা রাগ করে না? ঠোঁটের কোনে এক চিলতে হাসি ফুটিয়ে ৪২ বছরের মোসলেম বলেন, ''রাগ করবে কেন? ছেলে মেয়েরা ছোটবেলা থেকে আমাকে দেখছে তো! আমার স্ত্রী সর্বংসহা। তিনি বরং আমাকে সাহায্যই করেন''।

সরকারি সেরিকালচারের অস্থায়ী কর্মী মোসলেম। মাস গেলে কুল্যে হাজার তিনেক টাকা রোজগার। তাতেই চারটি পেট চলে। পাগল থাকলে পাঁচটি। হ্যান করেঙ্গা, ত্যান করেঙ্গা গোছের কোনও ঘোষণা নেই। 'কর্মযজ্ঞ' শব্দটাতেই ঘোর আপত্তি। চান না 'সমাজসেবকের' তকমাও। এক জন পাগল সুস্থ হয়ে উঠলে তিনি পরম তৃপ্তি পান। তাদের বাড়ি পৌঁছে দিতে পারলে তাঁর আরই তৃপ্তি।

কিন্তু পাগলে এত টান কেন? সমাজে তো আরও কাজ আছে।

মোসলেম জানান, এক সময় তিনি নিজেই পাকেচক্রে পাগল হতে বসেছিলেন। কিছু লোক আদর দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে তাঁকে সুস্থ করে তোলেন। তার পর থেকেই তিনি এমনধারা, পাগল দেখলে মাথার ঠিক থাকে না। তিনি তাকে বাড়িতে আনবেনই। কৃষ্ণনগর, ধুবুলিয়া, শান্তিপুর, শক্তিনগর, নাকাশিপাড়া ও বেথুয়াডহরিতে ঘুরে ঘুরে তিনি পাগল খোঁজেন। নিজের জামাকাপড় পাগলের গায়ে তুলে দেন। তারপর তাকে গল্প শোনান। এক পাগল মেরে তাঁর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু মোসলেম পাগলের গায়ে হাত তোলেননি। মাথার চুল সরিয়ে সেলাইয়ের দাগ দেখান মোসলেম।

বেতাইয়ের নৃপেন বিশ্বাস, কাটোয়ার জয়গোপাল রাজমশাই, খয়রাশোলের কাঞ্চন মন্ডলকে মোসলেমই ভাল করেছেন। উত্তরপ্রদেশের রাম মিশ্র ও ছত্তীশগঢ়ের অধেশ রামের মাথা থেকে পাগলের ভূত নামিয়েছেন তিনি। তিনি যে পাগলের পরিত্রাতা সে খবর বহু দূর ছড়িয়ে পড়েছে। অনেক পাগলের অভিভাবকেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কিন্তু টাকার অভাবে সবার দায়িত্ব নিতে পারে না মোসলেম।

পাগলের চিকিৎসা কি সহজ?

মোসলেম বলেন, ''মানবিক ব্যবহারই পাগলের সবচেয়ে বড় চিকিৎসা। তাতেও যদি না হয়। আমি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই। তাঁরা যে ওষুধপত্র দেন তা নিয়ম করে খাওয়াই। ডাক্তারদের সাহায্য ছাড়া একা এ-কাজ করা অসম্ভব।''

আপাতত মোসলেমের দোতলার ঘরে কোন পাগল নেই। সেখানে তিনি নিজেই আছেন। পাগল এলেই জায়গা ছেড়ে দেবেন এবং যথারীতি বলবেন, ''ভয় কী রে পাগল, আমি তো আছি।

ধর্ষণ, ভিক্ষা করানোর অভিযোগ, হোমের সম্পাদক গ্রেফতার

নিউজপেপার থেকে সংগৃহীত

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ হোমের মধ্যেই এক নাবালিকার উপরে টানা যৌন নির্যাতন চালাচ্ছিলেন বালির 'কিশোর ভারতী' নামে হোমের সম্পাদক। অন্যেরা ভয়ে সিঁটিয়ে থাকলেও আবাসিক অন্য দুই কিশোরী সহ-আবাসিকের উপর ওই 'অত্যাচার' দেখে থাকতে পারেনি। দিন কয়েক আগে হোম থেকে পালিয়ে যায় তারা। তারপর একটি মেয়ের মায়ের সাহায্য নিয়ে বুথ থেকে ফোন করে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার দফতরে। চাইল্ডলাইন ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন নামে সেই সংস্থার কর্মীরা বালির দুর্গাপুর -অভয়নগর পঞ্চায়েতর সেই হোমে গিয়েই বুঝতে পারেন দীর্ঘদিন এ ঘটনা চলছে। তাঁদের অভিযোগের ভিত্তিতে বালি থানার পুলিশ গ্রেফতার করে স্বপন রায় নামে হোমের সম্পাদককে।

এ ব্যাপারে তদন্ত শুরু করেছে রাজ্যের চাইল্ড প্রোটেকশন সেল। তাতেই জানা গিয়েছে, কিশোর ভারতী হোমে যৌন নির্যাতন নতুন নয়। ওই নাবালিকা সেই তালিকায় শেষ সংযোজন। সেই সঙ্গে হোমের আবাসিকেরা জানায়, যৌন নির্যাতনের পাশাপাশি প্রতিদিন সকালে স্কুলে পাঠানোর বদলে তাদের ঠেলে দেওয়া হত ট্রেনের কামরা কিংবা বাস স্ট্যান্ডে ভিক্ষা করতে। দিনান্তে ভিক্ষার রোজগারের উপরেই নির্ভর করত রাতে তারা কে কতটা খাবার পাবে। প্রোটেকশন সেল-এর রিপোর্ট তুলে দেওয়া হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্যের হাতে। ওই সেলের সদস্য-সচীব সুবির দে বলেন, ''রিপোর্ট পেয়েই উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় থেকে হাওড়া জেলাশাসককে ওই হোম বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়।''

তবে ঘটনার তিন দিন পরেও শনিবার বালির ওই হোমে গিয়ে দেখা গিয়েছে ২২জন কিশোর এবং ১২জন নাবালিকার অনেকেই এখনও ওই ঠিকানাতেই পড়ে রয়েছে। তাদের অনেকেরই আকুতি 'এখানে থাকতে ভয় করছে'! হাওড়ার জেলাশাসক খলিল আহমেদ অবশ্য আশ্বস্ত করেছেন, ''দু-এক দিনের মধ্যেই আবাসিকদের অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হবে''। স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান সিপিএমের সত্যজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ''আবাসিকদের নিরাপত্তার জন্যই হোম থেকে তাদের সরিয়ে নেওয়া প্রয়োজন।''

গত ডিসেম্বর মাসে মেয়েকে ওই হোমে ভর্তি করেছিলেন হুগলীর গঙ্গাধরপুরের এক বাসিন্দা। তিনি বলেন ''তাদের ব্যবসায় মন্দা। তার স্ত্রী হাওড়ার বিভিন্ন কারখানায় লোহার ছাঁট সংগ্রহের কাজ করেন। ওই হোমের খোঁজ পেয়ে হাজার টাকা দিয়ে মেয়েকে ভর্তি করেছিলাম। কথা ছিল স্কুলে পড়াবে। কিছুদিন আগে ওর মা দেখে করতে গিয়ে দেখেন মেয়ের খুব কাশি হয়েছে। তার ঘরের একটি মেয়েকে বলেছিল বুকে একটু তেল মালিশ করে দিতে''। আর সে দায়িত্ব নিজেই নেন হোমের সম্পাদক স্বপনবাবু। তেল লাগানোর ছলে প্রায় মাসখানের ধরে তিনি মেয়েকে নিয়মিত ধর্ষন করেন বলে অভিযোগ। হাওড়া জিলা হাসপাতালের মেডিকেল রিপোর্টেও তা প্রমাণিত।

সহ-আবাসিকের উপর অত্যাচার দেখে হোম থেকে পালিয়ে আসা রূপা বিশ্বাস এবং প্রিয়াঙ্কা নাথ জানায়, ''আমাদের কাছে কুড়িয়ে বাড়িয়ে ৭০ টাকা ছিল। তাই নিয়ে পালিয়ে আসি। আমাদের ভিক্ষা করাত। না করলে মারত। তবে আমরা ওর উপর অত্যাচার দেখে থাকতে পারিনি।

প্রিয়াঙ্কার মা মিতা নাথ মেয়ের ফোন পেয়ে চলে আসেন। তিনিই ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় ফোন করে ঘটনাটি জানান। সংস্থার আঞ্চলিক অধিকর্তা লিণ্ডা মজুমদার বলেন ''হাওড়ার ৮ নম্বর প্ল্যাটফর্মে আমাদের একটি শাখা রয়েছে। কোনও ভাবে নম্বর জানতে পেরে সেখানে গিয়েই অভিযোগ জানান ওঁরা।'' পুলিশ অবশ্য প্রথমে অভিযোগ নিতে

গড়িমসি করে। যদিও হাওড়া পুলিশ সুপার নীরজ সিংহ অবশ্য বলেন ''বালি থানা অভিযোগ পেয়েই ওই ব্যাক্তিকে গ্রেফতার করেছে।

ভিখারির ছদ্মবেশ আর ধরবেন না অরুন

নিউজপেপার থেকে সংগৃহীত

বাপি মজুমদার ● চাঁচল

কখনও ঘন্টার পর ঘন্টা ভিখারি সেজে রাস্তার ধারে বসে কুখ্যাত ডাকাত ধরেছে। ছদ্মবেশে কাজ হাসিল করতে গিয়ে কয়েকবার ছুরি মারার চেষ্টা হয়েছে তাকে। একবার দুস্কৃতীরা তাঁকে লক্ষ করে গুলিও ছোড়ে। প্রতিবারই সেই লড়াইয়ে জিতেছেন তিনি। কিন্তু, শুক্রবার রাতে সন্দেহভাজন মাওবাদীদের সঙ্গে লড়েও শেষ রক্ষা করতে পারলেন না জিআরপি-র কনস্টেবল অরুন ভদ্র (৩৫)। সন্দেহভাজন মাওবাদীরা চিরতরে দুনিয়ে থেকে সরিয়ে দিয়েছে তাঁকে।

'সাহসী' ও 'প্রতিবাদী' চরিত্রের পুলিশকর্মী হিসেবে পরিচিত অরুনবাবুর মৃত্যুর খবর পেয়েই নিহতের পরিবারের একজনকে চাকরি ও এককালীন ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষনা করেছে রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তাতে কত দূর কী হবে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় বাড়ির সকলেই। অরুনবাবুর মা চন্দনাদেবী ও স্ত্রী শ্যামলীদেবী বারেবারেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলছেন। অরুনবাবুর একমাত্র সন্তান অঙ্কুরের বয়স ৮। বাবা নেই, একথা সে বিশ্বাসই করতে পারছে না। তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন পাড়া-পড়শিরা।

চাঁচলের ভারতীনগরের বাসিন্দা অরুনবাবু সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে ছিলেন অত্যন্ত সহজ ও সরল। কর্মক্ষেত্রে ছিলেন কঠিন। তাঁর মতো সাহসী ও প্রতিবাসী পুলিশকর্মীকে আলাদা চোখে দেখতেন পদস্থ অফিসাররাও। তিনি কুমেদপুর স্টেশনে কর্মরত ছিলেন। ১১ বছরের কর্মজীবনে বরাবরই সাহসিকতার জন্য নিজের বিভাগে প্রশংসিত হয়েছেন। ইদানিং মালদহ-কাটিহার প্যাসেঞ্জার ট্রেনেই তাঁর ডিউটি পড়ছিল। মালদহের পুলিশ সুপার ভূবন মন্ডল ও শিলিগুড়ির রেল পুলিশ সুপার জয়ন্ত পাল, দুজনেই অরুনবাবুর সাহসিকতার প্রশংসা করেছেন। পুলিশের পক্ষ থেকে ওই পরিবারের লোকজনকে সব রকম সাহায্য করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

অরুনবাবুর বাবা অখিলবাবুও পুলিশে চাকরি করতেন। অবসরপ্রাপ্ত অখিলবাবু এখন রোগে প্রায় শয্যাশায়ী। তাঁর দুই ছেলে ও এক মেয়ে মধ্যে ছোট ছিলেন অরুন। বড় ছেলে শারীরিক প্রতিবন্ধী। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিলেন অরুনবাবুই। শয্যাশায়ী অখিলবাবুকে শনিবার বিকেল পর্যন্ত তাঁর ছেলের মৃত্যু সংবাদ কেউ দেননি। বাড়ির লোকজন মালদহ সদর হাসপাতাল থেকে দেহ নিয়ে শেষকৃত্য করতে গিয়েছিলেন তাকে বলা হয়েছে ছোট ছেলের স্ত্রী অসুস্থ বলেই মালদহে যেতে হচ্ছে সকলকে।

এইদিন দুপুরে বাড়ির বিছানায় শুয়ে অখিলবাবু বলছিলেন, ''ছোট ছেলেকে নিয়ে আমার কোনও চিন্তা নেই। যত চিন্তা বড় ছেলেটাকে নিয়ে। আমারও শরীরটা খুব খারাপ। হাঁটতে পারি না। ছেলে বাড়ি এলে এবার ভাল করে ডাক্তার দেখাব। ওই তো আমার ভরসা।

এককাট্টা হতে সংগঠন প্রতিবন্ধী ভিক্ষাজীবিদের

নিউজপেপার থেকে সংগৃহীত

অনল আবেদিন ● রঘুনাথগঞ্জ

পাকুড় গাছের নীচেই এককাট্টা।

ওই ছোট্ট ছায়াটুকুই সদর দফতর। আর সেইটুকুই যা অন্য রকম। প্রতিবন্ধী ভিক্ষাজীবিদের সংগঠন 'জঙ্গিপুর প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতি' রীতিমতো সরকারি খাতায় নথিভুক্ত ইউনিয়ন। রয়েছে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট। নিয়মিত তাঁদের সভা ডাকা হয়। সেই সভায় কী কী সিদ্ধান্ত হল, তা একবার লিখে ফেলার পরে, আর অন্যথা হওয়ার জো নেই।

মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জের পদ্মাপাড়ের গ্রাম বড়জমলায় তাই ওই পাকুড় গাছের নীচে সভা ডাকা হলে, চৈত্রের ভরদুপুরেও ঠিক হাজির হয়ে যান সমিতির ৯৬ জন সদস্য। তাঁদের কারও হাঁটু থেকে পায়ের নীচের অংশটি নেই। কারও দৃষ্টিশক্তি শৈশবেই চলে গিয়েছেন। কারও ভরসা বলতে হাতে চালানো তিন চাকার একটি সাইকেল। রয়েছেন মহিলারাও। সব সদস্যদের জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট আচরণ বিধি। কেউ যদি সভায় আসতে না পারেন, তা হলে তাঁকে সে কথা আগে থেকেই জানিয়ে দিতে হয়।

আর এই এককাট্টা হয়ে থাকাটাই তাঁদের প্রধান শক্তি বলে জানিয়ে দিলেন সমিতির সম্পাদক কায়মুদ্দিন শেখ। তাঁর কথায় ''আমরা একে বিকলাঙ্গ তার উপরে ভিক্ষাজীবি। তাই কেউ আমাদের তোয়াক্কা করত না। ন্যায্য সরকারি সুযোগ পর্যন্ত আমরা পেতাম না। তাই দল বেঁধেছি। আর তাতে ফলও মিলেছে হাতেনাতে। তাই এখন দলে সদস্যও বাড়ছে।'' কীরকম ফল পেয়েছেন? কায়মুদ্দিন বলেন, ''চাকা লাগানো গাড়িতে করে আমাদের অনেকে ভিক্ষা করতে যান। কিন্তু জঙ্গিপুর-লালগোলা রুটের বাস-ট্রেকারের চালকেরা রাস্তা ছাড়তে চান না। ফলে দুর্ঘটনা ঘটে। এমনতে অনেক বলে কোনও লাভ হয়নি। শেষে দল বেঁধে আন্দোলনে নামলাম, তার পর থেকে আর সমস্যা হয়নি। ''কায়মুদ্দিন বলেন, ''সরকারি নিয়ম অনুসারে প্রতিবন্ধিদের বাসভাড়ায় ছাড় আছে। কিন্তু অনেকে জবরদস্তি পুরো ভাড়া দাবি করেন। তখন অধিকার আদায় করতে সমিতি পক্ষ থকে হস্তক্ষেপ করা হয়।''

তা ছাড়াও, সমিতির দায়িত্ব আছে। যেমন, পেশাগত এলাকা, অর্থাৎ কে কোন এলাকায় ভিক্ষা করবেন, তা নিয়ে বিরোধ মেটাতে সমিতির বক্তব্যই শেষ কথা। দৃষ্টিহীন ভিক্ষাজীবিদের অনেক সময় লাঠি ধরে গ্রাম-গ্রামান্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য সঙ্গে থাকে কোনও বালক বা কিশোর। সেই সাহায্যকারীর মজুরি কত হবে তা নিয়েও বিরোধ ঘটলে মেটানোর দায়িত্ব সমিতির। সংগঠনের সদস্য হতে যে ১০০ টাকা লাগে, বা মাসিক চাঁদার ১০টাকা দিতে কোনও আপত্তি নেই সদস্যদের। সে টাকা সমিতি চালাতে লাগে। আবার দুঃস্থ ভিক্ষাজীবির অসুখের সময়ও দেওয়া হয়।

সমিতি অবশ্য গঠিত হয়েছিল সেই ১৯৭২ সালে। কিন্তু তখন টিমটিম করে চলত। বছর আষ্টেক আগে থেকে তা অনেক বেশি সংঘবদ্ধ ভাবে কাজ করতে শুরু করে। সরকারি ভাবে নথিভুক্তও হয়। পাত পেড়ে লুচি আলুর দম মিষ্টি খাইয়ে বড়জুমলায় একবার ঘটা করে সম্মেলনও করা হয়েছে তারপর। সহ-সম্পাদক মহাসিন আলি বলেন, ''ওই সম্মেলন অনেকে অনেক রকমের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। কিন্তু তার ৮ বছর পরও কিন্তু সমিতির সদস্যদের ভাগ্যে প্রতিবন্ধী ভাতা, বার্ধক্য ভাতা কিছুই জোটেনি।'' কংগ্রেসের বিধায়ক আবু হেনা সম্মেলনে ছিলেন। তিনি বলেন, ''বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ওই প্রতিবন্ধীদের সহায়ক গাড়ি ও আনুষাঙ্গিক উপকরণ দেওয়া হয়। স্থানীয় সেখালিপুর গ্রাম

পঞ্চায়েত আমাদের দখলে। পঞ্চায়েত প্রধানকে বলে ওই প্রতিবন্ধী ভিক্ষাজীবিদের ভাতার ব্যবস্থা করা হবে। ''রঘুনাথগঞ্জ ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সিপিএমের ওয়াহিদা বেগমও আশ্বাস দেন, ''প্রতিবন্ধী ভাতার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।''

তাই সমিতির দায়িত্ব ক্রমশ বাড়ছে। স্থানীয় প্রশাসনও এই সমিতির কাজে খুশি, লালগোলা পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ রবিউল ইসলাম বলেন, ''ধরা যাক ৫০ দরিদ্রকে খাওয়াবেন বলে কোনও সম্পন্ন গৃহস্থ মনস্থির করেছেন। খাওয়ানোর সময় দেখা গেল পঙক্তিভোজে বসে গিয়েছেন ১০০জন ভিক্ষাজীবি। গৃহকর্তা তখন বিপাকে পড়েন। ভিক্ষাজীবিদের ইউনিয়ন হওয়ায় এখন কত জনকে খাওয়ানো হবে তা ইউনিয়নের সভাপতি বা সম্পাদককে আগাম বলে দেওয়া হলে, সেই মতো দরিদ্র মানুষ নেমন্তন্ন খেতে হাজির হন। তাতে দুপক্ষেরই সুবিধা।''

ভবঘুরে-ভিক্ষুকদের করোনা টিকার নির্দেশ মমতার

এই সময় , ২০/০১/২০২২ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধায়ের নির্দেশ মেনে মহানগরে ভবঘুরে, ভিক্ষাজীবী এবং মানসিক ভারসাম্যহীনদের টিকার আওতায় আনতে উদ্যোগী হয়েছে কলকাতা পুরসভা।

পুরসভা সুত্রের খবর খুব শীঘ্রই এই ধরণের মানুষকে চিহ্নিত করে টিকাকেন্দ্রে আনা শুরু হবে। সে জন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাহায্য নেওয়া হবে। সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সারা দেশে সব থেকে বেশি ভবঘুরে এবং ভিক্ষুকের বাস বাংলাতেই, প্রায় ৮১ হাজার। শুধু কলকাতাতেই প্রায় ৩০-৩১ হাজার ভবঘুরে, ভিক্ষাজীবী এবং মানসিক ভারসম্যহীন মানুষ রয়েছে, যাঁদের সে অর্থে কোনও ঠিকানা নেই। এদের অধিকাংশ এখনও টিকার প্রথম ডোজ পাননি।

এই সময়

ভিক্ষার সঞ্চয় ব্যাঙ্কে ৮৫ হাজার, কলকাতায় চিকিৎসা শুরু বৃদ্ধার

এই সময়, মগরা রাস্তার ধারে হংসেশ্বরী মন্দিরের চাতালে ভিক্ষা করেই দিন গুজরান করতেন মগরার বোরোপাড়ার বাসিন্দা মালতী দাস। আত্মীয় পরিজন ও কোনও পিছুটান না থাকায় মন্দিরের চাতালেই থাকতেন মালতী। ভবিষ্যতের কথা ভেবে ভিক্ষা করে যা পেতেন তার থেকে তিনি সঞ্চয় করতেন। সপ্তগ্রামের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ভিক্ষার সেই টাকা জমে দাঁড়িয়েছে ৮৫ হাজারে। বুকের টিউমারে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়া মালতীর চিকিৎসা শুরু হল ভিক্ষার সেই সঞ্চয়েই।

করোনা কালে মন্দিরে মানুষের আনাগোনা নিয়ন্ত্রিত হতেই রোজগারে টান পড়ে মালতীর। বয়সের ভার ও বুকের মধ্যে বাড়তে থাকা টিউমার নিয়েও মন্দিরের চাতালে ভিক্ষা করছিলেন বৃদ্ধা। রবিবার আচমকা তাঁর টিউমার ফেটে গেলে অসুস্থ হয়ে পড়েন মালতী। মন্দিরের আশেপাশে থাকা লোকজন মালতীকে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে

নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা জানিয়ে দেন কলকাতা মেডিকেল কলেজে তাঁর চিকিৎসা করাতে হবে। তার জন্য টাকার প্রয়োজন।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক প্রায় ৮৫ হাজার টাকা জমিয়ে ছিলেন মালতী। সোমবার মালতী টাকা তুলতে তাঁর পরিচিত দুই মহিলাকে নিয়ে ব্যাঙ্কে যান। কিন্তু তাঁর কোনও প্যানকার্ড নেই। ব্যাঙ্কে থেকে জানানো হয়, অত টাকা তুলতে গেলে প্যান কার্ড থাকা জরুরি। টাকা কী ভাবে তুলবেন, তা নিয়ে চিন্তায় পড়েন বৃদ্ধা। তখনই স্থানীয় একজন সংবাদ মাধ্যমের কর্মী এগিয়ে আসেন। সতীশ গুপ্তা নামে ওই সাংবাদিকের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কে নিজের অ্যাকাউন্ট ছিল। তিনি ওই বৃদ্ধার হয়ে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন। এর পরেই টাকা তুলতে পারেন বৃদ্ধা মালতী।

সতীশ বলেন, 'ব্যাঙ্কে কাজে এসেছিলাম। দেখি একজন বৃদ্ধা কান্নাকাটি করছেন। তার মুখে সব শোনার পর খুব মন খারাপ হয়ে যায়। ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে ব্যাঙ্কের সহায়তায় বৃদ্ধার জমানো টাকা তোলার ব্যবস্থা করেছি।'

মালতীর এক পরিচিত বালির বাসিন্দা সনিয়া সাউ বলেন, 'ঠাকুমার বন্ধু হন মালতী। আমাদের বাড়ি যাতায়াত ছিল। তিনি অসুস্থ শুনে আমরা দেখতে আসি। চিকিৎসার জন্য টাকা প্রয়োজন। তাই তাঁর জমানো টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাচ্ছি'।

ভিখারিনির কুঁড়েঘরে 'যকের ধন'

এই সময়, রায়গঞ্জ সামনে বিছানার ছেড়া চাদরের উপর ডাঁই করে রাখা পাঁচ-দশ-কুড়ি টাকার নোট। পাশে কয়েক হাজার খুচরো কয়েন। মঙ্গলবার জনা দশেক মানুষ দিনভর গুনেও শেষ করতে পারলেন না ভিখারিনির সঞ্চয়। বাকি টাকাপয়সার হিসেব করতে আজ বুধবার ফের বসা হবে বলে জানিয়াছেন উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরে মৃত ভিখারিনি কণিকা মহন্ত (৪০)-এর পরিবার। এদিন কুঁড়েঘরে 'গুপ্তধন'-এর খবরে ভিড় করেন প্রতিবেশীরা। স্থানীয় বাসিন্দা নিখিল দাস বলেন, 'আজ দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ১ লক্ষ ৭ হাজার টাকা গোনা হয়েছে। আরও কিছু টাকা ও খুচরো পয়সা রয়েছে একটি বাক্সে, চটের বস্তায় ও ক্যারি ব্যাগে। আলো কমে আসায় সেগুলির হিসেব আর করা যায়নি।'

ইসলামপুর শহরের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের লোকনাথ কলোনি এলাকায় বেড়ার ঘরে একাই থাকতেন বছর চল্লিশের কণিকা মহন্ত। পাশে সরকার থেকে পাওয়া ছোট্ট পাকাঘরে থাকতেন তাঁর বৃদ্ধা মা, দাদা ও এক বোন। শহরে ভিক্ষা করেই নিজের পেট চালাতেন কণিকা। আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরে নানারকম অসুখে ভুগছিলেন কণিকা। গত বুধবার নিজের ঘরেই তাঁকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন পরিবারের সদস্যরা। আত্মীয় ও প্রতিবেশীরা মিলে সেদিনই তাঁর দেহ সৎকার করা হয়। তাঁর ঘরে ঢুকে তিনটি ট্যাঙ্ক দেখতে পান মৃতার দাদা, বৌদি ও অন্য আত্মীয়রা। ট্রাঙ্ক খুলতেই চোখ কপালে ওঠে সকলের। তাঁরা দেখেন, প্রচুত ৫, ১০, ২০ টাকার নোট। সঙ্গে অজস্র ১ টাকা, দু'টাকা ও ৫ টাকার কয়েন। এমন অপ্রত্যাশিত 'যকের ধন'-এর খবরে কৌতুহলে প্রতিবেশীরা ভিড় জমান ভিখারিনির দুয়ারে। মঙ্গলবার মেঝেতে বাক্স উপুর করে হাত-পা ছড়িয়ে সেই গচ্ছিত টাকা-পয়সা শুনতে বসে পড়েন পরিজনরা।

মৃত কণিকাদেবির দাদা বাবলু মহন্ত বলেন, 'আমরা গরীব মানুষ। আমি নিজে গা-গতর খাটিয়ে বিভিন্ন কাজ করে কোনও রকমে সংসার চালাই। বাড়িতে অসুস্থ মা রয়েছেন। তার মধ্যেও বোনকে যতটা সম্ভব দেখার চেষ্টা করতাম। বোন ভিক্ষা করে নিজের পেট চালাতেন। আমরা জানতাম না যে সেই উপার্জিত অর্থ এভাবে বাক্সবন্দি করে জমিয়ে রেখেছে। আজ দেখে মনে হচ্ছে, নিজে কষ্ট করে ভবিষ্যতের জন্য হয়তো বোন এই টাকাগুলো সঞ্চয় করেছে।'

প্রতিবেশি হারাধন সেন বলেন, 'মেয়েটি ভিক্ষে করেই আজীবন অতিবাহিত করত। অসুস্থ হয়ে কার্যত বিনা চিকিৎসায় মারা গেল। ভিক্ষা করে যে টাকা জমিয়েছিলেন তার পরিমান লাখ খানেক ছাড়াবে। পাড়ার লোকেরা চাইছেন, তার গচ্ছিত ওই টাকা-পয়সার কিছু অংশ তাঁরই শ্রাদ্ধশান্তিতে কাজে খরচ করা হোক। বাকি টাকা তাঁর মায়ের নামে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত থাক।' কণিকাদেবীর দাদা বাবলু মহন্তও প্রতিবেশীদের পরামর্শে সহমত পোষণ করেছেন। তিনি বলেন, ''আমিও চাইছি, বোন যে টাকা রেখে গিয়েছে সেটা ওঁর পারলৌকিক কাজে ও মায়ের জন্যই খরচ হোক।'

কিছুদিন আগে মুম্বইয়ের 'ধনী' ভিখারি ভরত জৈন-এর সঞ্চয় শুনে চোখ কপালে উঠেছিল অনেকের। কণিকার 'লক্ষ্মীর-ভাঁড়ার' দেখেও অনেকে সেই তুলনা টানছেন।

আমার নাম মিঃ.....

দীপঙ্কর মিত্র

''আপনি কিন্তু ইংলিশ বাক্যটা ভুল লিখলেন।'' আমি কে? আমি একজন ভিখারী। ভূতনাথ মন্দিরে ভিক্ষে করি, বাবুদের দেওয়া মানত করা খাবার আর মন্দিরের খিচুরি প্রসাদ খেয়ে যাই হোক তাই হোক করে এই শুয়োরের বাচ্চা জীবনটাকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। দাদা, বাবু আমাকে এক গ্লাস মদ খাওয়ান না, পয়সা নেই, দশ টাকাও নেই— আপনি তো মশাই আমার থেকেও বড় ভিখারী। দূর মশাই একগ্লাস মদ খাওয়াতে পারবেন না। আচ্ছা, তাহলে আমাকে একটা টুরিং ব্যাগ আর একটা পাঞ্জাবী আর সোয়েটারের ব্যবস্থা করে দিন। কাল নিয়ে আসবেন তো? আপনার মতো আমার একটা ছেলে ছিল। আপনাদের মতো আমারও একটা ছোট্ট, সুন্দর, খুব সুন্দর সংসার ছিল, আমিও চাকরী করতাম, আমি ছিলাম অফিসার। মশাই আমি ক্যালকাটা ইউনিভারসিটি থেকে ইংলিশে এম. এ। আমার কাহিনী শুনবেন? আমার নাম? যা ইচ্ছে ধরে নিন। অনেক দিন আগে আমার একটা নাম ছিল, পরিচয় ছিল, আমার নিজের কেনা একটা ফ্ল্যাট ছিল— এই কলকাতাতেই। একমাত্র ছেলেকে অনেক সুখে বড় করেছিলাম; জানি না মানুষ করতে পেরেছিলাম কিনা। আমি অফিসে যেতাম, আর আমার ছেলে যেতো স্কুলে আর আমার ভালবাসার স্ত্রী থাকতেন তাঁর সুখের সংসার আলো করে। হঠাৎ একদিন ছেলেটা বড় হয়ে গেল যেন হঠাৎ একটি ঘটনা। প্রেমে পড়ল, চাকরী পেল। বিয়ে করল। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই আমি বুড়ো দাদু হয়ে গেলাম। চলছিল ভালোই সুখ ও দুঃখের বয়ে যাওয়া নদীর জলের মতোই। বয়ে যাচ্ছিল জীবনের প্রত্যেকটা দিন। স্ত্রীর হলো শরীর খারাপ। ডাক্তার বলল ক্যানসার, অনেক চেষ্টা, অনেক খরচ করেও বুঝলাম ওকে আর ধরে রাখতে পারবো না। শেষ অবলম্বন ছিল বাধ্য হয়ে অফিস থেকে চুরি করা পয়সা। ধরা পড়লাম অভ্যেস না থাকার কারণে। একমাত্র অবলম্বন চাকরীটা গেল। ছেলে গেল বিগড়ে। ওর যুক্তি ছিল মা যখন বাঁচবেই না তখন মায়ের পিছনে বোকার মতন এত টাকা খরচ করে পয়সা নষ্ট করা কেন— এই আকালের বাজারে। শুনে খুব মুষড়ে পড়লাম। মুখে কিছু বলিনি। কিন্তু অনেক

আগেই ঠিক করেছিলাম যে শ্রেষ্ঠ অবলম্বন এই থাকার ফ্ল্যাটটা বিক্রি করে স্ত্রীর চিকিৎসা করবো। কোনদিনই ভাবিনি ভিক্ষে করতে হবে, রাস্তায় শুতে হবে, বাংলা মদ খাওয়ার জন্য আপনাদের মতো লোকের কাছে হাত পাততে হবে। ছেলে যেদিন জানতে পারলো ফ্ল্যাটটা পরের মাসে বিক্রি হচ্ছে সেও তার পরিবার নিয়ে আমাদেরকে টা-টা করে অন্য জায়গায় চলে গেল। ফ্ল্যাট বিক্রি হল, চিকিৎসা হল, ছেলের ভাষায় পয়সা নষ্ট ও খরচা হল। আমার স্ত্রী আমায় ছেড়ে অন্য জগতে আশ্রয় নিলেন আর আমি আশ্রয় নিলাম ভূতনাথ মন্দিরের এই চাতালে। আপনাদের কাছে আমি একজন বাস্তুহারা, ঘরছাড়া, হা-ভাতে, হা-ঘরে ভিখিরীর পরিচয়ে হাজির। এর আগে সত্যি বলতে কি, ভিখারিদের ঘৃণা করতাম। আমার নাম ? আমার নাম মিঃ..... ।

কমলার কথা

কৃষ্ণা পাল

মানসিক ভারসাম্যহীন কমলার মা কোথায় যে চলে পাঁচ-ছয় বছরের ছোট্ট কমলা তা বোঝার অনেক আগেই ওর বাবা টুক করে একটা নতুন মা বাড়ি নিয়ে এল। ছোট্ট কমলা এর পরেই অন্যান্য অনেক বাচ্চার সঙ্গে রাস্তার ফুটপাতে একা একা কিন্তু নিঃসঙ্গ নয়— অবশ্যই নিজের দায়িত্বে বড় হতে শুরু করল। প্রথম ভিক্ষাবৃত্তি ও পরে বাবুর বাড়িতে কাজ করতে করতেই আলাপ হয় ট্যাক্সিচালক রামুর সঙ্গে। প্রথমে ভালবাসা তারপরে বিয়ে। এরপরে শুরু হয় আকাশের নীচে সাময়িক সুখের সংসার। চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী দুই সন্তানের জন্ম — স্বামীর মদ খেয়ে মারধর, অত্যাচার এবং স্বামীর তাদের ছেড়ে চলে যাওয়া সবই ঘটে যায় অল্প সময়ের মধ্যে। এরপর একদিন কাজের বাড়ীর বাবু কমলাকে কু-প্রস্তাব দেওয়াতে কমলা মানসিকভাবে আঘাত পায় আর সবকাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে শুরু করল নিজের স্বাধীন ব্যবসা ''কাগজ কুড়ানো''।

বাচ্চারা বড় হল। শুরু করল নেশা। হল্লাগাড়ী প্রায়ই আসে শহর থেকে গরীবকে উচ্ছেদ করার জন্যে। এই করতে করতে তার ছেলেরা একদিন হারিয়ে গেল। কমলা এখন প্রতিদিন ভিক্ষা করে যা পায় তা দিয়ে ফুটের হোটেলের ভাত খায়। যেদিন ভিক্ষে জোটে না, সেদিন হোটেলের ভাতও জোটে না। কমলা সারাদিন বসে বসে ভাবে আর কাঁদে আর আকুল দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চেয়ে মৃত্যু কামনা করে।

একটি জীবনী

দীপঙ্কর মিত্র

আমি শম্ভু-শম্ভু মন্ডল। ভূতনাথ - নিমতলা শ্মশান অঞ্চলে রেললাইনের ধারে ৬ ফুট / ৬ ফুট জায়গার মধ্যে ৮টা ভাঙ্গা বাঁশের কঞ্চি আর ছেড়াখোঁড়া প্লাস্টিকের আচ্ছাদন দেওয়া ছোট্ট একটা বাক্সের মতো কাল্পনিক রাজপ্রাসাদের মধ্যে আমি আর একমাত্র সম্বল-অভিভাবক-ভালবাসা বিধবা মাকে সঙ্গে নিয়ে আমার স্বপ্নময় জীবনের আস্বাদ গ্রহণ করে চলেছি। আমার মা পৃথিবীর সব থেকে ভাল মা। মা ভালবেসে অনেক কাঁচাকাঁচা খিস্তি-খেউর যখন করে আমিও কিন্তু তখন মাকে ছাড়ি না, কিন্তু এই মায়ের কোল ছাড়া রাতে আমার ঘুমও আসে না।

ঘুম থেকে সকালবেলা ৮টার আগে আমি উঠতে পারি না। ঘুম থেকে উঠে মায়ের দেওয়া ৫-৬ টাকার মধ্যে যা হোক কিছু কিনে খাই। এরপরে সোজা চলে যাই আমাদের পৃথিবী বিখ্যাত নিমতলা শ্মশান। ''বল হরি হরি বল'' মাঝে মাঝে বদমাস ছেলেগুলো 'মড়া' আনার সময় আওয়াজ রোলে ''বল হরি হরি বল'' — বুড়ি মরেছে কাঁধে তোল— আসছে বছর আবার হবে''। শম্ভুও হাসে আর ভাবে একদিন তার মাকেও শ্মশানে নিয়ে গিয়ে জ্বালিয়ে ছাই করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিতে হবে।

শম্ভু জুয়া খেলে, প্রত্যেকদিন দু-তিনটে সিনেমা দেখে- অবশ্যই ভিডিওতে প্রতিদিন সিনেমা দেখার জন্য ওর খরচ হয় ৯ থেকে ১০টাকা। যদিও শম্ভু ওর মায়ের থেকে প্রতিদিনের হাতখরচ বাবদ ২০টাকা করে নেয় এছাড়াও ওর নিজের প্রতিদিনের ভিক্ষে করা ২০-২২টাকা ঐ হাত খরচের সঙ্গে যোগ হয়। ভিক্ষে করা ছাড়াও শ্মশানের ''মড়া পোড়ানো''-তে সাহায্য করার জন্যে, গঙ্গায় ডুব দিয়ে পয়সা তোলা থেকে - গঙ্গার মাটি বিক্রি থেকে - মৃতদেহের বিভিন্ন কাপড়-গামছা প্রভৃতি বিক্রি, প্রতিমার গঙ্গায় ভেসে যাওয়া বাঁশের কাঠামো জোগাড় করে বিক্রির মধ্যে দিয়ে শম্ভুর সারামাসের 'হাতখরচ' জোগাড় হয়। শম্ভুর ভাষায় মেয়েরা হল চায়ের ভাঁড় - সেই চা খেয়ে নাকি ভাঁড় ফেলে দিতে হয়। হায় ! শম্ভুতো আপনাকে শম্ভুর বয়সটাই বলে নি। শম্ভুর বয়স তখন ছিল ১৪ বছর।

''আমি শম্ভু মন্ডল। বয়স এই ২০০৬ সালে ১৭ বছর। আমি মেয়েদেরকে এখন আর চায়ের ভাঁড়ের সাথে তুলনা করি না। আজ থেকে তিন বছর আগে প্রথমে শিখেছিলাম রেডিও সারানো আর এখন আমি এফ.এম. রেডিও তৈরী করে বিক্রি করি। এর সঙ্গে টি.ভি.ও সারাই। আমি এখন সমাজের মূলস্রোতে ভাসতে থাকা তোমাদেরই দৈনন্দিন জীবনের অংশ। আমার নাম শম্ভু মন্ডল।''

আঞ্জিরা দিদি

সীতারা বেগম

আজ থেকে ২০ বছর আগে প্রথমে খিদিরপুর মনসাতলা মোড়ের উল্টোদিকে ট্রামলাইন এর সঙ্গে যে ফুটটা আছে সেখানে আঞ্জিরার জন্ম হয়। সেই জায়গায় এখন বিশাল বড় বিল্ডিং তৈরী হয়েছে। বাকী ফুটপাতের বাচ্চার মতো আঞ্জিরাও ছিল। কখনো কাগজ কুড়াতো রাস্তায় রাস্তায়। কখনো কখনো ডেইলি লেবার যেমন রাজমিস্ত্রির কাজ করতো ৮ থেকে ১২ ঘন্টা। পড়াশোনার দিকে আঞ্জিরা তেমন কোন সুযোগ পায়নি। সারাদিন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সিনেমা বা ভিডিও দেখে বেড়াতো। কিশোরী অবস্থায় আঞ্জিরাকে নানান সমস্যায় পড়তে হয়েছে। রাত হলেই তার ঘুমানো খুবই মুশকিল হয়ে যেত। কারণ আঞ্জিরা বলে আমরা যখন ঘুমাতে যেতাম তখন এই ফুটপাত দিয়ে কত অপরিচিত লোক যায় তার ভেতর গুন্ডা, বদমাইশও থাকত। তারা সেখানে কিশোরী মেয়েদের গলায় ক্ষুর দেখিয়ে বলাৎকার করেছে। আঞ্জিরা বলে যখন এইসব ঘটনা ঘটতো তখন আমি তাড়াতাড়ি মায়ের আঁচল মুখে ঢেকে মাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়তাম। কিশোরী অবস্থায় আঞ্জিরা পাশের ঝুপড়ির এক কিশোর আমিন খান এর সঙ্গে প্রেমে পড়ল এবং দুজনেই বড়ো মসজিদে কিছু সাক্ষীকে নিয়ে রেজিস্ট্রি করল। বিয়ের কিছুদিন পর তারা যেখানে এখন আছে সেখানেই এক ঝুপড়ি তৈরী করল। প্রথম যেখানে ফুটপাতে ছিল সেখানে বিল্ডিং তৈরী করবে বলে তাদের তুলে দেওয়া হয়, ভাগ্যক্রমে সেই সময় খিদিরপুর মনসাতলা মোড় থেকে ফ্লাইওভার তৈরী হচ্ছিল, কিছু ভুলের জন্য অর্ধেক তৈরী হয়ে সেটা বন্ধ হয়ে যায় এবং তারা সেই ফ্লাইওভারে প্লাসটিকের শীট লাগিয়ে নিজের থাকার জায়গা ঠিক করে। সেই

সময় পুলিশ বার বার তাদের পিছনে লাগে, তাদের ঝুপড়ি ভেঙ্গে দেয়, আবার অনেক সময় পুরুষ মহিলা, বাচ্চাদের নিয়ে গাড়িতে তুলে ভিক্টোরিয়া মাঠে ছেড়ে দিত যাতে তারা সেই জায়গাটা ছেড়ে দেয়। বর্তমানে আঞ্জিরার দুই ছেলে ফারুক যার বয়স ১২ বছর আর সারুখ যার বয়স ১০ বছর এবং একটি মেয়ে আঞ্জিনা খাতুন যার বয়স ৬ বছর। আঞ্জিরার স্বামী যে কাজ পেত সেই কাজ করতো-কখনো রাজমিস্ত্রির কাজ আবার কখনো রাস্তার কাজ ইত্যাদি। কিন্তু এই কাজ ১৫ দিন হতো ১৫ দিন হতো না। স্বামীর ঠিক মতো কাজ না হওয়া এবং কাজ করে যা কামিয়ে নিয়ে আসতো জুয়া এবং সাট্টা খেলায় তাও হেরে যেত। এই কারণে আঞ্জিরার সংসারে অশান্তি হত। আঞ্জিরা নিজের সংসারকে বাঁচানোর জন্য দুটো বাড়ীতে কাজ ধরে নিল এবং বড় ছেলেকে পাশের এক চায়ের দোকানে কাজে লাগিয়ে দিল। আঞ্জিরা যেখানে কাজ করো সেখানে ৩০০ টাকা দিত এবং তার ছেলে যেখানে কাজ করতো সেখানে প্রতিদিন ২০টাকা করে দিত। কিন্তু কিছুদিন পর আঞ্জিরার কাছে নালিশ এল ''তুমি পরিষ্কার জামাকাপড় পরে কাজ করতে এসো''। যখন তাদের এই কথাগুলো আঞ্জিরা শুনলো না আঞ্জিরাকে বাড়ীর কাজ থেকে বার করে দিল। এখন আঞ্জিরা ভিক্ষা চায় প্রত্যেক বৃহস্পতিবার সাইয়াদ বাবার বাজারে গিয়ে ৪০ থেকে ৫০ টাকা ভিক্ষা করে এবং খাবার জিনিসও কিছু পায়। আঞ্জিরা বলে ভিক্ষা চাইতে ভালো লাগে না। জানি কারোর যদি শরীর থেকে লাচার হয় এবং বৃদ্ধ হয় তারা ভিক্ষা চাইলে কোন অসুবিধা হয় না কিন্তু আমি তো লাচার নই। কিন্তু আমাকে লোকের বাড়িতে কাজ দিচ্ছে না এই কারণে যে আমার কাপড় নোংরা। যখন দেখলাম কিছু একটা না করলে আমার সংসার চলবে না তখন আমি ভিক্ষা চাইতে আরম্ভ করলাম। আঞ্জিরার শ্বশুড়বাড়ী আছে নন্দীগ্রামে, সরবরিয়া মেদিনীপুরে। সেখানে থাকার জন্য শুধু ছাদ আছে। বছরে একবার যায়। আঞ্জিরার নিজের গ্রাম খুবই ভালো লাগে। আঞ্জিরা বলে গ্রামে শান্তিতে থাকি কিন্তু সেখানে খাবার নেই। এই খাবারের জন্য আজ এইখানে থাকা। আঞ্জিরার স্বামী যা কামাচ্ছে তা জুয়াতে উড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু আঞ্জিরা চাইছে তার ভবিষ্যৎ ভালো হোক এবং আঞ্জিরা এবং তার স্বামীর চিন্তাধারা এক হোক, তার বাচ্চা স্কুলে যাক এবং তার একটা থাকার ঘর হোক।

পড়তে চায়, তাই ভিক্ষা করে অন্ধ বালক সমিরুদ্দিন

আনন্দবাজার পত্রিকা

স্কুলে গেলে খেতে পাবে জেনে প্রথম শ্রেণিতে ভিড়েছিল হতদরিদ্র ভ্যানচালকের ছেলে সমিরুদ্দিন শেখ। জন্মান্ধ সমিরুদ্দিন আলো দেখেছিল স্কুলে গিয়েই। ব্রেল নয়, চক্ষুষ্মানে পদ্ধতিতেই অক্ষরজ্ঞান হয়েছে তার। আলোর তাড়নায় এলাকার মাদ্রাসায় উর্দু শিখতে যায় সে। কিন্তু অভাবের সংসারে ১২ বছরের 'সমর্থ' ছেলের বসে খাওয়ার জো নেই। তাই পড়ার খরচ চালাতে এখন ট্রেনে ট্রেনে গান শুনিয়ে ভিক্ষা করে অন্ধ পড়ুয়া। সঙ্গী ভাই নাজিমুদ্দিন।

মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের মুকুন্দপুর গ্রাম। এই গ্রামের চার মেয়ে আর পাঁচ ছেলের বাবা হায়দার আলি শেখের অভাবের সংসার দুই মেয়ের বিয়ে দেওয়া গেলেও ভ্যানরিকশা চালিয়ে পরিবারের বাকি সবার মুখে দু'বেলা দুমুঠো খাবার তুলে দিতেই নাভিশ্বাস ওঠে হায়দারের। ছেলেমেয়ের পড়াশোনার দাবি সেখানে অলীক আবদার। তৃতীয় সন্তান সমিরুদ্দিন আবার অন্ধ।

এ বছরের গোড়ায় একদিন মিড-ডে মিল নাম খাদ্যের নিশ্চিন্ত সুলুকসন্ধান পেয়েই স্কুলে গিয়েছিল সমিরুদ্দিন। অন্ধ ছেলের বিদ্বান হওয়ার স্বপ্ন নয়, বাবা হায়দার হয়ত ভেবেছিলেন, একটা পেটের একবেলার ব্যবস্থা অন্তত হল।

কিন্তু গোল বাঁধল সেখানেই। স্কুলে গিয়েই আলো দেখে ফেলল সমিরুদ্দিন। কয়েক দিন যেতে না যেতেই

পড়ার নেশা চেপে ধরল তার, শুরুতে অবশ্য শুধু শোনার নেশা । মাস্টারমশাইদের পড়ানো শুনতে বুঁদ হতে শুরু করল অন্ধ ছেলেটা। তার নিজের কথায়, ''ওঁদের পড়ানো শুনতে আমারও লেখার ইচ্ছে হল। সে কথা আমি মাস্টারদের বললাম, অসাধ্য সাধন করলেন মাস্টারমশাইরাও। অন্ধকে লিখতে শিখিয়ে দিতে জ্ঞানের তৃষ্ণা দিন দিন বাড়তে লাগল সমিরুদ্দিনের। কারণ গরিব পরিবারে আর বাকি বাচ্চার মতো রোজগেরে হয়ে ওঠেনি সে। উল্টে অভিভাবকদের কাছে লেখাপড়ার জন্য বই-খাতা-পেলসিল দাবি করে বসেছে। এই খরচটুকু জোগাড়ের সামর্থও নেই তার হতভাগ্য বাবার। বড় একটা অন্ধকারের সামনে এসে অন্ধ পড়ুয়া। কী করবে সে? পড়া ছেড়ে দেবে?

অনেক ভেবে দিশা বের করে নিজেই। মাস তিনেক আগে অনেক ভোরে, তার চিরকালের অদেখা সূর্য যখন সদ্য উঠেছে, ১০ বছরের ভাই নাজিমুদ্দিনকে সঙ্গে নিয়ে বহরমপুর শহরে চলে আসে সমিরুদ্দিন। খরচ আর পড়ার বিরুদ্ধে সংসারের প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে গান ও ভিক্ষার পথ বেছে নেয় এ দেশের আরও একজন অন্ধ কানাই। ট্রেনে গান মূলত গায় তার ভাই। গানও ঠিক বলা যায় না তাকে।

তবে শক্ত করে হাত ধরে থাকা অন্ধ দাদাকে দেখিয়ে অল্পসল্প মেলে। বহরমপুর বা কাটোয়া স্টেশনে দেখা পাওয়া যায় ভিখারি রাম-লক্ষণ দেখা মেলে আজিমগঞ্জ-কাটোয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেনে। তবে রোজ নয়। কাটোয়া প্ল্যাটফর্মে একটা ছোট খাবার স্টলে বসে সমিরুদ্দিন জানায় সপ্তাহে তিন দিন ভিক্ষা আর তিন দিন স্কুল।

ভিক্ষের তিন দিন বিকেল বেলায় বাড়ি ফেরা। ফিরে মায়ের কাছে দিনের উপার্জন তুলে দেয় সে। তার পর বই-খাতা গুছিয়ে কোনওদিন এক যুবকের কাছে পড়তে যায়। না হলে একা-একাই পড়তে বসে। প্ল্যাটফর্মের স্টলে বসেই তার ভাই নাজিমুদ্দিন বলে, ''দাদাকে দেখে পড়তে ইচ্ছে করে!'' পাশাপাশি একটা আশার কথাও জানায় সে, ''দাদা লেখাপড়া শিখে অনেক বড় হয়ে অনেক রোজগার করবে, তখন আমরা পারব।''

কথা বলার ফাঁকে হুইসেল বাজিয়ে দেয় আজিমগঞ্জ যাওয়ার ট্রেন ছুটতে ছুটতে উঠে পড়ে দুই ভাই প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শোনা যায় কচি গলার আর কচি সানুরে ''আপনারা আমার অন্ধ দাদাকে ভিক্ষা দেবেন?

উচ্ছিষ্ট নিয়ে ঝগড়ায় প্রাণ গেল বালকের, কিশোরী ধৃত

(নিউসপেপার থেকে)

বিয়েবাড়ির এঁটো পাতা খুঁটে খাবার সন্ধানের লড়াইয়ে প্রাণ গেল ১২ বছরের প্রকাশ পাইকমারার। প্রাণ গিয়েছে ১৪ বছরের এক কিশোরীর ছোড়া ইঁটের ঘায়ে।

বুধবার রাতে এই ঘটনা ঘটেছে আসানসোল দক্ষিণ থানার বরাচকে। খুনের অভিযোগে ধৃত চামেলি পাইকমারা নামের ওই কিশোরী এখন কলকাতার শিশু আদালতে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার বরাচকে একটি বিয়েবাড়ির বাইরে এঁটো পাতার স্তূপের সামনে ভিড় জমিয়েছিল একদল ছেলেমেয়ে। এই দলেই ছিল চামেলি আর প্রকাশ। অনুষ্ঠানবাড়ির উচ্ছিষ্টের স্তূপে খাবার খোঁজা এই তাদের প্রথম নয়। প্রথমে উচ্ছিষ্ট নিয়ে বচসাও। প্রকাশ ও চামেলি দুজনেই পাইকমারা সম্প্রদায়ের। খুব গরিব এই সম্প্রদায়ের ৫০টি পরিবার গত ৪০ বছর ধরে বরাচকের একটি ফাঁকা জমিতে বস্তি তৈরি করে বসবাস করে আসছেন। পেশা অধিকাংশেরই নেই। যাঁদের আছে, তাঁরা দিন মজুর।

বুধবার রাতে এঁটো পাতার মধ্যে প্রকাশ একটি আধ-খাওয়া বেগুনি খুঁজে পায়। গোলমালের মুখবন্ধ সেটাই। এ কথা জানিয়েছেন প্রকাশের মা এবং প্রত্যক্ষদর্শী বাসিন্দারা। জানিয়েছেন, আধ-খাওয়া বেগুনিতে চোখ পড়ে চামেলিরও। এই দুই নাবালকের মধ্যে চামেলি বয়সে বছর দুয়েকের বড় হওয়ায় সে জোর খাটিয়ে প্রকাশের হাত থেকে বেগুনির টুকরো কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। প্রকাশ সে সুযোগ দেয় না। চামেলিকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে বেগুনি সটান চালান করে দেয় নিজের মুখে। মাথায় রক্ত চেপে যায় চামেলির। আধলা ইট তুলে প্রকাশের দিকে ছুড়ে মারে। আধ-খাওয়া বেগুনি সামলাতে পারলেও আধলা ইট সামলাতে পারেনি ১২ বছরের প্রকাশ। বুকে গিয়ে লাগে ইট। লুটিয়ে পড়ে সে। ক্ষণিকের ছটফটানি। এঁটো পাতার রণক্ষেত্রেই মৃত্যু হয় প্রকাশের।

প্রকাশের পড়ে যাওয়ার কথা কাঁদতে কাঁদতে বস্তিতে ছুটে এসে জানায় ১৪ বছরেরর চামলি নিজেই। যেটুকু চামেলি বুঝতে পেরেছে, তার মুখে সেটুকু শুনেই বিয়েবাড়ির দিকে ছুট লাগান পাইকমারা বস্তির বড়রা। তাঁরা এসে প্রকাশের নিথর দেহ আসানসোল মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসকেরা জানান, প্রকাশের মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতাল থেকেই খবর যায় থানায়। চার গাড়ি পুলিশ আসে পাইকমারা বস্তিতে। লোকারণ্যে বস্তি থেকে পুলিশ তাকে নিতে এসেছে শুনে ধীর পায়ে জিপে চেপে যায় চামেলী।

বৃহস্পতিবার দুপুরে ময়না তদন্তের পরে প্রকাশের কাটা-ছেঁড়া দেহ তুলে দেওয়া হয় তার মা-বাবার হাতে। বস্তিতে গিয়ে দেখা যায়, একমাত্র সন্তানের মৃত্যুতে মা পূর্ণিমা পাইকমারা মাটিতে আছাড় খাচ্ছেন। বাবা বাচো পাইকমারা নিস্পলক বসে রয়েছেন মৃত ছেলের খাটিয়া স্পর্শ করে। একটু তফাতে দাঁড়িয়ে চামেলির মা সীতামনি পাইকমারা। এক বস্তির ছেলে প্রকাশের মৃত্যু শোকার্ত করেছে তাঁকেও। কিন্তু তাঁর মাথার মধ্যে 'খুনি' মেয়ের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের চিন্তাও রয়েছে। সীতামনি দেবী বলছেন, ''ওই একটু ভালমন্দ খাবারের লোভে বাচ্চাগুলো বিয়েবাড়ির আশপাশে ঘোরাঘুরি করে। খুঁটে খায়। ঝগড়াও হয়। তেমনই হয়েছে হয়তো! প্রকাশটাকে মেরে ফেলার জন্য আমার মেয়ে নিশ্চয়ই ইট ছোড়েনি!''

আসানসোলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার বলেন, ''ধৃতকে কলকাতায় শিশু আদালতে পাঠানো হয়েছে।'' দুপুরে কলকাতায় যাওয়ার আগে একটা প্রশ্নেরও জবাব দেয়নি চামেলি। শুধু গাড়ি ছেড়ে দেওয়ার আগে ঘাড় ঘুরিয়ে বাবাকে জিগ্যেস করেছে, ''প্রকাশ কেমন আছে?''

অভাগিনী

একটি কাল্পনিক গল্প - উত্তম বেরা

শহর ছেড়ে কয়েকশ মাইল দূর পলাশপুর গ্রাম যেখানে বাস করতো অভাগিনী। খুব ছোট বয়সে বাবা থালায় বসিয়ে বিয়ে দিয়েছিল। স্বামীর বাড়িতে অভাগিনী বড়ো হলো, এক সময় মা ও হলো। তার কিছুদিনের মধ্যে স্বামী মারা গেল। সংসারে যা কিছু ছিল বিক্রয় করে সংসার পরিচালনা করলো। কিন্তু অসহায় হয়ে গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে এসেছিল অভাগিনী। শিশু পুত্রকে নিয়ে প্রথমে বারাণসীতে কতগুলো বদমাইস লোকের তাড়া খেয়ে ছুটতে ছুটতে এক মন্দিরের সামনে পড়ে এক পুরোহিতের সাহায্য নিয়ে প্রাণ বাঁচায়, তারপরে কোলকাতায় চলে এসে বাবুর বাড়িতে কাজ করতে থাকে। জীবনের চরম সর্বনাশ ঘটে যায় যখন ছেলেটা কোথায় যে হারিয়ে যায়, আর তার বাবু পরে তাকে বিক্রি করে দেয় এক নিষিদ্ধ পল্লীতে। জীবনে চলে আর এক অন্ধকারময় জীবন। মানসিক ও শারিরীক অত্যাচার দিনের পর দিন চলতে চলতে শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ''আর রোজগার করতে পারতাম না। একদিন তাড়িয়ে দেয় আমাকে। আমার শেষ আশ্রয়

হয় শহরের রাজপথ, খোলা আকাশের নীচে। ছেলের জন্য মনটা আমার হাউ-হাউ করে কেঁদে ওঠে। এপথ ওপথ ঘুরে মানুষের কাছে হাত পেতে ভিক্ষা করে দিনে একবার খাবার জুটে, চোখেও ঠিকমত দেখতে পাইনা।" ভিক্ষার ফাঁকে ফাঁকে কখনো বলে আমার ছেলেকে ডেকে দেবে বাবা। অভাগিনীর মনে হয় ছেলে কাছে পিঠে আছে। 'হায়রে সমাজে নারী হয়ে জন্ম হয়েছিল বলে কি আমার এমন দুর্দশা। অভাগীনী তার সমস্ত অধিকারের উর্দ্ধে উঠে একথা শুধু ভাবছে কখন আমার মৃত্যু হয়। শরীর আর দেয় না, ঠিকমত হাঁটাচলা করতে পারে না। লাঠি এখন সম্বল।' খোলা আকাশ শহরের ফুটপাত আজ তার ঘর। কবির ভাষায় বললে ঃ

"মাটির ভিতর হবে ঘর,
সুন্দর জীবনের হবে অবসান।"

পালানি

শুচিস্মিতা চন্দ্র

কার্ত্তিক সর্দার শোভাবাজার অঞ্চলে রিক্সা চালায়, কল্পনা সর্দার বাবুর বাড়ী কাজ করে। তিন বোন ও এই ভাইয়ের সংসারে পালানিও অংশ। দুই বোনের বিয়ের পরে পালানি এক ভাই ও বাবা মাকে নিয়ে শোভাবাজারে ফুটপাতে খোলা আকাশের নীচে কোনরকম সুযোগ সুবিধা ছাড়া যাই হোক - তাই হোক করে বেঁচে আছে। মাঝে মধ্যে কর্পোরেশনের 'হল্লা' আসে ফুটপাত থেকে এই নোংরা, এঁদো মানুষগুলোকে উৎখাত করার জন্য। সঙ্গে আসে পুলিশ। অত্যাচারের পর অত্যাচারের সঙ্গে অনাচার, দুর্ভিক্ষ, খাদ্যের জন্য হাহাকার, শিক্ষার জন্যে উদ্বেগ, স্বাস্থ্যের জন্য ভিক্ষা আর অনেক হতাশার মধ্যে এরা বেঁচে আছে। পালানি টি.ভি.তে সিনেমা দেখে। শোভাবাজার মেট্রোস্টেশনের সামনে থেকে ভিক্ষা চায় ও কাগজ কুড়ায়। সব মিলিয়ে সারাদিনে ৩০ টাকার আশেপাশে উপার্জন হয়। ঐ টাকা পুরোটাই প্রায় সংসারে খরচা হয়।

পালানির বাথরুম পায়খানা ব্যবহারের জন্যে যেতে হয় সুলভে। প্রতিবারের জন্যে খরচ হয় ১ টাকা করে। তাই সে সকালে ও দুপুরে সুলভে গেলেও রাতে কিন্তু রাস্তাতেই প্রাতঃকর্ম করে।

পালানি কিন্তু স্কুলে যেতে পছন্দ করে না, পালানির মনে হয় পড়াশুনোর বদলে কাজ করলে যেন একটু সাশ্রয় হয়। স্কুলে ওর ছবি আঁকতে ভাল লাগত।

পালানির বাবামায়ের মধ্যে সম্পর্ক ভাল না। পালানির বাবা সারাদিন কষ্ট করে রিক্সা চালিয়ে সমস্ত রোজগার মদ খেয়ে ও জুয়া খেলে নষ্ট করে দেয়। মাঝেমধ্যে ওর বাবা আবার ওর থেকে টাকা নিয়ে মদ, চুল্লু খায় আর জুয়া খেলে। যদি পয়সা না পায় তখন ওর বাবা ওকে আর মাকে গালিগালাজ করে ও সঙ্গে মারধোর। পালানির ইচ্ছা বড় হয়ে মায়ের কষ্ট দূর করবে কারণ বাবার থেকে মাকে বেশী ভালবাসে। পালানি মাঝেমাঝে মাঠে মেয়েবন্ধুদের সাথে গোলা, ধরাধরি খেলা খেলে, সন্ধ্যেবেলা মাঝে মধ্যে যখন বন্ধুদের সাথে ক্লাবে টি.ভি দেখতে যায় তখন ক্লাবের ছেলেরা ওকে অনেক খারাপ প্রস্তাব দেয়, কাজের লোভ দেখায় আর বলে যে ওদের সঙ্গে থাকলে অনেক টাকা উপার্জন হবে। পালানি কিন্তু ক্লাবের ঐ দাদাদের সঙ্গে বসে টি.ভি. দেখে, তাস খেলে, তিরঙ্গা-শিখর-গুটকা খায়। খেয়ে নেশা হয়। ঐ দাদাদের মধ্যে

অনেকেই পালানির গোপন অঙ্গে হাত দেয়। ওর মা এসব জানে না। পালানিও টি.ভি. দেখতে কম যায়।

পালানি বড় হয়ে কাজ করতে চায়, উপার্জন করতে চায়, একটু সুস্থভাবে বাঁচার জন্যে এই ফুটপাত ছেড়ে দিয়ে প্রথম একটা ভাড়া ঘরে এবং তারপরে একটি ছোট্ট সুন্দর আপন ঘর করতে চায়- এই পালানির স্বপ্ন।

এক ভিখারী বৃদ্ধার জীবনী

উত্তম বেরা

আজ থেকে ২০০ বছর আগে ইংরেজদের হাতে মানুষ যেমন অত্যাচারিত নিপীড়িত হত — আজও স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে সাধারণ মানুষ অর্থাৎ গরীব মানুষ সমস্ত দিক থেকে শোষিত অত্যাচারিত হচ্ছে। দীর্ঘদিন জনগনের সঙ্গে কাজ করতে করতে বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা বলব। গত দুবছর আগে এই রকম একজন বৃদ্ধার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। একদিন বৃদ্ধার জীবন কাহিনী শুনে আমার গায়ের লোম ফুলে উঠেছিল। তাঁর আদিবাস ছিল বাংলাদেশের খুলনা জেলায়। হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার সময় বৃদ্ধার স্বামীর মৃত্যু হয় এবং জায়গা-জমি, ঘর-বাড়ি সব কেড়ে নেওয়া হয়। বৃদ্ধার বিয়ের ছ'মাসের মধ্যে তার জীবনে অন্ধকার নেমে আসে। তারপরে সে দেশ ছেড়ে চলে আসে— ঠিকানা হয় মানিকতলার খালপাড়। বৃদ্ধার পরনে ছিল শতছিন্ন একটি শাড়ি, শত সেলাই-এর চিহ্ন এবং তাতে হালকা গোলাপী রঙের আভা দেখা যাচ্ছিল। কোন এক কালে সেই শাড়ী সহৃদয় রমনীর দেহ শোভাবোর্দ্ধন করত। কিন্তু বৃদ্ধাকে অত্যন্ত বেমানান লাগলেও লজ্জা নিবারণের জন্য সেই শাড়ি পরতে হয়েছিল। চোখে ভালোমত দেখতে পায় না, ঠিকমত পথ চলতে পারে না। জিজ্ঞাসা করলাম— আপনি বেড়িয়েছেন কেন? ভিক্ষা না করলে খামু কি, কেউ তো একমুঠা ভাত দিবা না। আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বলিল একটাকা দিবে বাবা? আমি বুড়িকে একটা টাকা দিলাম, কাপড়ের থলে হাতে দোকানে দোকানে ঘুরে ভিক্ষা করত। মাঝে মাঝে দেখা হলে ১টাকা দিতাম এবং জীবন কাহিনী শুনতাম। কিছুদিন হল বৃদ্ধাকে আর দেখতে পাই না, মনে মনে ভাবলাম বৃদ্ধা এখান থেকে অন্য কোথাও গেছে, অসুস্থ হয়ে পড়েছে। মনের মধ্যে সাত- পাঁচ চিন্তা হল। প্রতিদিনের কাজের মত যেদিন মানিকতলার দিকে কাজে গেলাম দেখলাম খালপাড়ে অনেক লোক একজায়গায় জড়ো হয়েছে। অনেক লোক দেখে এগিয়ে বললাম ও দাদা কি হয়েছে? একজন বললেন গত রাতে 'বুড়ি' শীতে মারা গেছে। বুকটা ধড়াস্ করে উঠলো, সেই বুড়ি নয় তো? এগিয়ে গিয়ে দেখলাম একটা বুড়ি মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে আছে। পাশে কাপড়ের থলে। চোখ দিয়ে সেইদিন জল গড়িয়ে পড়েছিল। কয়েক জনের সঙ্গে আলোচনা করে বুড়ির সৎকারের ব্যবস্থা করলাম। 'বুড়ি'কে মাটি দেওয়া হয়েছিল কারণ 'বুড়ি' মুসলিম ছিলেন। আমার নিজের কেউ ছিল না, কিন্তু খুব কষ্ট হয়েছিল। সেদিন মনে হয়েছিল 'বুড়ি' সমস্ত অধিকারকে ছাড়িয়ে চলে গিয়েছে। সংবিধানে যে সাধারণ মানুষের অধিকার দেওয়া আছে তার কোনটা ভোগ করা তার এ জীবনে হল না। দীর্ঘ কয়েকমাস পরে ঐ রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, গিয়ে একটা মিটিং করলাম গৃহহীন মানুষদের সঙ্গে। কিছু সময় গিয়েছিল হঠাৎ দেখি থলে হাতে সেই শতছিন্ন কাপড় পড়ে দাঁড়ালো সেই বৃদ্ধা। দেখে অবাক হলাম। জিজ্ঞাসা করলাম কোথায় ছিলেন এতদিন? দেখতে পাই নি কেন? আমার শরীর খুব খারাপ ছিল বাবা, বেরোতে পারিনি'। 'বুড়ি' কে একটাকা দিলাম। সে চলে গেল। সেই দিন যে 'বুড়ি'র সৎকার করেছিলাম আসলে সেই 'বুড়ি' এই 'বুড়ি' নয়। সেদিন আমার চিনতে ভুল হয়েছিল — কারণ আমাদের দেশে থলে হাতে অনেক 'বুড়ি' আছে।

ভালবাসা-ভালবাসা

মৌমিতা গাঙ্গুলী

নাম সরিফা বিবি। বয়স ৩৫ থেকে ৩৬ হবে। লোকে যদি ভিক্ষার ঝুলিতে পয়সা তুলে দেয়, তবেই তার সংসার চলে। নইলে না খেয়েই দিন কাটে সরিফা ও তার পরিবারের। পরিবার বলতে তার তিন মেয়ে এবং একটি ছেলে এবং তার বাবা। তার বয়স্ক বাবাও ভিক্ষা করে। সরিফার প্রথম বিয়ে হয় জয়নগরে। তখন তার বয়স ১৫ থেকে ১৬ বছর। এই স্বামী রঙের কাজ করত। সরিফার বড় মেয়েটি এই স্বামীর। সরিফা বলে ''বড় মেয়েটা হওয়ার পরই আমার স্বামী অন্য মেয়ে বিয়ে করে আমায় ছেড়ে চলে যায়।'' এরপরই সরিফা রাজাবাজারে থাকতে শুরু করে আর ভিক্ষা করে পেটের চাহিদা মেটায়। তারপর সরিফার জীবনে আসে আরেক পুরুষ। সেও থাকত জয়নগরে। এই স্বামীর সাথে সে বহুদিন সংসার করে। তাদের দুটি কন্যা সন্তান ও একটি ছেলে হয়। এরপর এই স্বামীও সরিফাকে ছেড়ে অন্য নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয় ও তাকে নিয়ে জয়নগরে থাকতে শুরু করে। সরিফার বক্তব্য — ''কেউই তাকে ভালোবাসেনি, যখন যার ইচ্ছা হয়েছে তার সাথে থেকেছে, তারপর যখন আর ভালো লাগেনি, ছেড়ে অন্য জায়গায় গেছে।'' কিন্তু সরিফাকে এখনও বয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে চারটি সন্তানের ভার। প্রথম স্বামী বড় মেয়েকে অর্থাৎ তার নিজের সন্তানটিকে সরিফার কাছে চায়। কিন্তু সরিফা তাকে দেয় না। আর মেয়েটিও মায়ের কাছেই থাকবে বলে। কিন্তু সরিফার দ্বিতীয় স্বামী তাকে ছেড়ে যাওয়ার পর থেকে আর একবারও এই সংসারের দিকে তাকায়নি। সরিফা এখন ভিক্ষা করে। সরিফার বাবা সরিফার সাথেই থাকে। সেও ভিক্ষা করে। ''শুক্রবার বেশী ইনকাম হয়''— বলল সরিফা। কারণ সেদিন সে তিনপাড়া ঘোরে। 'রাজাবাজার', 'চামরাপট্টি', 'পাটোয়ার বাগান'। সরিফা জানায় শুক্রবার ৬০-৭০ টাকা ইনকাম হয়। গতবছর মাঘ মাসে সরিফার দ্বিতীয় স্বামী সরিফাকে ছেড়ে চলে যায়। এখন আর তার সাথে সরিফার কোন যোগাযোগ নেই। সরিফা বলে- 'আমি যা ভিক্ষা করে পারি, যেভাবে পারি ছেলেমেয়েকে খাওয়াব। ওদের থেকে কিছু নিতে আমার ঘিন্যা লাগে।'' সরিফার বড় মেয়ের আর স্কুলে যাওয়া হয় নি। কারণ ছোট ভাই বোনকে তার কাছে রেখেই তার মা বেরোতো ভিক্ষা করতে। তবে মেজো মেয়েটা কেজি স্কুলে যায়। এভাবেই জীবনের প্রতিটি দিনকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে সরিফা।

সংগ্রামী রেহানার গল্প

মমপাপা ফাউন্ডেশন

রাজাবাজার খালপাড়ের বাসিন্দা রেহানা বিবি। রেহানার প্রথম বিয়ে হয় বিহারে। স্বামীর নাম সেলিম। তাদের ছেলে মেয়েও হয়। কিন্তু তারপর থেকেই সেলিম বেশীরভাগ সময় বাড়ির বাইরেই কাটাতে শুরু করে। যখন ঘরে আসে মদ খেয়ে নেশা করে। রেহানার বক্তব্য —''তার ঐ মেয়ের নেশা ছিল ভীষণ। প্রথম দিকে বুঝিনি, পরে বুঝতে পারি।'' অর্থাৎ ছেলে মেয়ের সব ভার রেহানার ওপর এসে পড়ে। আর তার স্বামী নতুন নারী, মদের নেশায় আরো ডুবতে থাকে। একদিন তার সাথে দেখা হয় 'রাজু শেখ' বলে আরেকজন পুরুষের সাথে। রাজুর সাথে রেহানার সম্পর্ক ঘনিষ্ট হয়। রাজুর একবার বিয়ে হয়ে গেছে এবং তার স্ত্রী এখনও আছে জেনেই রেহানা রাজুকে বিয়ে করে। রেহানা বলে - ''সেও আমার স্বামী ছেড়ে দিয়েছে, ছেলে মেয়ে আছে জেনেই বিয়ে করে।'' বর্তমানে রেহানা সন্তান সম্ভবা। রাজুর সন্তান তার গর্ভে। রেহানা বলে - ''রোজ নেশা করে আসবে। যা না তাই গালাগালি করবে। আমাকে মারধোর

করবে। সেদিন বটি দিয়ে মাথায় কোপ মেরেছে।" রেহানার মাথার কিছুটা অংশে অনেকটা কাটা দেখা গেল। রাজু কাগজ কুড়ায়। এছাড়াও খালপাড়ের লোকজন কয়েকটা দোকানের সাথে যোগাযোগ করে দেয়। রেহানার কথায় জানা যায়। ''যেদিন ইচ্ছে হয় কাজে যায়, যেদিন ইচ্ছে হয় যায় না, শুধু বলে - তুমি কাজ কর, আমায় টাকা দাও, খাওয়াও। রেহানার অসুস্থ শরীরের মধ্যেই তার স্বামী তার ওপর প্রতিদিন-ই ওইরকম শারীরিক অত্যাচার করে। কখনো বটি, কখনো লাঠি যা পায় তাই দিয়ে মারে। তার স্বামীর কথা হল— ''ওই ছেলে মেয়ে আমার না, আমি খেতে দিতে পারব না। তোর জিনিস তুই খাটবি, তুই খাওয়াবি।" এরকম পরিস্থিতিতে অধিকাংশ দিনই রেহানা ও তার সন্তানদের না খেয়ে থাকতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই একটা প্রশ্ন এসেই যায় এমন স্বামীর অবস্থা, থেকে থেকে শুধু অত্যাচার, তা সত্ত্বেও সে আবার সন্তান নিতে গেল, কেন? রেহানা বলে—''স্বামী বলেছে ঐ সন্তান তোমার আগের স্বামীর, তারা আমাকে যদি না দেখে, না খেতে দেয়, তাই আমার ছেলে মেয়ে লাগবে।" কিন্তু রেহানা এই সিদ্ধান্তে খুশি নয়। সে বাধ্য। রেহানা জানায় এই সন্তানের জন্মের পর সে অপারেশন করে নেবে। সে নিজে তো কষ্ট পাচ্ছেই তার সাথে এতগুলো নিরীহ শিশুকে সে কষ্ট দেবে না। রেহানা আরো বলে - ''পুরুষগুলোই সমান। বিয়ে করতে ইচ্ছে হল করল। ফেলে দেবে ভাবল ফেলে দিল"। কি করব? এভাবেই একদিন মরে যাব।

আনন্দের আনন্দ

দীপঙ্কর মিত্র

হ্যাঁ কাকু, আমার নাম আনন্দ। সত্যি বলছি আমার নাম আনন্দ। বাড়িতে কে কে আছে? বাড়িতে মা, একটা বোন, একটা ছোট্ট দাদা আর আমি। আমি থাকি নৈহাটিতে। আমার বাবা অনেকদিন আগে, যখন আমি খু-উ-ব ছোট্ট ছিলাম আমাদেরকে ছেড়ে দিয়ে ভয়ে পালিয়ে গেছে। বহুৎ হারামি ছিল। আমার মনে নেই। কিন্তু মা বলে। তিন ক্লাস পর্যন্ত লেখাপড়া করেছি। লেখাপড়া করে কোন দাম নেই। আর আমার মায়ের লেখাপড়া চালাবার মত ক্ষমতাও নেই। তাই আমার মা আর বোন একসঙ্গে লোকেদের বাড়ি কাজ করতে যায়। আমার ছোট্ট দাদাটা কি - কি কাজ করে কেউ জানে না। মনে হয় চুরি-চামারি করে। কিন্তু ও আমাকে খুব ভালবাসে।

আমি কোথায় থাকি? আমি থাকি কৃষ্ণনগরে। আমার নাম বলব না। বলেছি তো একবার। আগে দশ টাকা দাও তবে সব বলব। প্রতিদিন সকাল আটটার সময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে শিয়ালদার ট্রেন ধরি। শিয়ালদায় এসে দুপুর একটা পর্যন্ত ভিক্ষে করি। দুপুর বেলা শিয়ালদার একটা হোটেল থেকে খাবার খাই। কি খাবার? যারা হোটেলে খেতে আসে, তাদের খেতে না পারা বাকি খাবারটা আমাকে ওদের হোটেলে যে ছেলেটা কাজ করে সে দেয়। না গো পয়সা নেয় না। ঐ ছেলেটাকে আমি পটিয়ে নিয়েছি। ঐ ছেলেটাও ছোটবেলায় ভিক্ষে করত। ওরও খুব দুঃখ। ওর কেউ নেই। হ্যাঁ, শোনো দুপুরে খাবার পরে আমি একটা পান খাই। এক টাকা দাম। এরপরে এখন আমি দমদমে যাব এই ট্রেনে চড়ে। তারপর ওখানে তিনটে পর্যন্ত ভিক্ষা করব। তারপর আমি আর ডিউটি করি না। সোজা সোদপুরে আমার বাড়ি চলে যাই। প্রথমে বাড়ি ফিরে চান করি। আমরা ব্রাহ্মণ তো, এমনি সব ভিখিরিদের মত নই। এরপরে মা আমাকে কিছু খাবার দেয় - যে দিন যেমন জোটে। আমি মাকে সারাদিনে যত পয়সা কামাই করেছিল সব দিয়ে দিই। কত হয়? ৫০-৭০ টাকার মধ্যে। মা পুরো টাকাটা 'ভান্ডারে' ঢুকিয়ে দেয়। অনেক বড় বড় মাটির ভান্ডার-সাতটা ভান্ডার ভর্তি হয়ে গেছে। মা সব ভান্ডার গুলো মুখ বন্ধ করে চৌকির তলায় লুকিয়ে রেখে দিয়েছে। মা যখন কাজে যায় তখন একটা তিরিশ টাকা দামের তালা একটা লোহার চেন দিয়ে দরজায় আগল দিয়ে যায়। কেন বলো তো? যদি চুরি

হয়ে যায়? একবার হয়েছিল। তখন আমরা সবাই মিলে খুব কেঁদেছিলাম। কিন্তু এখন দরজা বন্ধ থাকে।

এত পয়সা দিয়ে কি করব? সাত হাজার টাকা হলে মা বলেছে একটা গুমটি দোকান নেবে। তখন মা ও আমি পালা করে দোকান চালাব। আর বোন কাজ করবে।

আমি কিরকম ভাবে ভিক্ষে করি? আমি মুখে অল্প ধুলো মেখে নি, চুলটা এলোমেলো করে দি। এভাবে পয়সা চাই সবার থেকে। বেশি করে মেয়েদের থাকে। মেয়েরা ভিক্ষে বেশি দেয়। আর যারা একটু গরীব গরীব ধরণের তারাও দেও। কিন্তু শালা, যারা বড়োলোক তারা কম দেয়। ধরো দেয়ই না। কাকু, সত্যি বলব, আমি মাঝে মাঝে উত্তরীয় পরে ভিক্ষা করি। তখন বলি যে, আমার বাবা মারা গেছে, তার শ্রাদ্ধের জন্য পয়সা দাও।

কেন ভান্ডারে পয়সা রাখি, কোথায় রাখব? ব্যাঙ্কের কাগজ আমাদের নেই। হ্যাঁ, হ্যাঁ রেশন কার্ড আছে - সাদা রঙের রেশন কার্ড। ঐ জন্যেই তো মা পয়সাগুলো ভান্ডারে রাখে। আমি বড় হয়ে ব্যবসা করব, অনেক বড় দোকানদার হব — এটাই আমার স্বপ্ন। আমার এখন মাত্র তেরো। বড় হতে আর মাত্র দু বছর বাকি।

কিন্তু তুমি কে? তুমি এই ট্রেনে করে কোথায় নামবে?

হিজড়েরা কি আমাদের মতো যাবতীয় সরকারি সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে?

সেখ আব্দুল আজিম

সবার সমান অধিকারের কথাই বলা হয়েছে। সংবিধানের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদে আছে সমানাধিকারের বিষয়টি। আবার সংবিধানের ১৫ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সরকার কোনভাবে কোন ভারতীয় নাগরিককে ধর্ম, জাতি, লিঙ্গ এবং জন্মস্থানের ভিত্তিতে কোনভাবে পৃথকীকরণ করবে না। সরকারি সুযোগ সুবিধা সব নাগরিক সমানভাবে পাবে। আমরা এই সমানাধিকারের প্রসঙ্গে দেশের বিভিন্ন সরকারি সংস্থার পদস্থদের সামনে একটি প্রশ্ন তুলে ধরেছিলান, তা হল উভলিঙ্গ বা বৃহন্নলা — সোজা বাংলায় যাদের বলা হয় হিজড়ে — তারাও তো মানুষ, তারা কি একজন সাধারণ মানুষের মত সব ধরনের সরকারি সুযোগ সুবিধা পেতে পারে? আমাদের এই প্রশ্ন তোলার কারণ, সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য কোন মানুষকে বাসস্থান, জাতি, ধর্ম জানানোর পাশাপাশি তার লিঙ্গ বা সেক্স জানাতে হয় অনেক ক্ষেত্রেই। অর্থাৎ সে নারী না পুরুষ। এইখানেই সমস্যায় পড়ে বৃহন্নলারা। যেহেতু তারা উভলিঙ্গ তাই নির্দিষ্ট করে তারা লিঙ্গ লিখতে পারে না। আমরা যোগাযোগ করি বিভিন্ন সরকারি সংস্থায়। জানতে চাই বৃহন্নালা কিংবা উভয়লিঙ্গদের জন্য তাদের কী নিয়মনীতি আছে? অর্থাৎ এরা কি কোন ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারে কিংবা করতে পারে কোন জীবন বিমার পলিসি? এখন তো ডাকঘরেও সঞ্চয়ের একটা প্রচলন হয়েছে। তাহলে কোন বৃহন্নলা কি ডাকঘরে গিয়ে সাধারণ মানুষের মতো টাকা জমা রাখার সুবিধা পেতে পারে? অথবা পারে মেডিক্লেম করতে? রেল ভ্রমণের জন্য বৃহন্নলাদের ক্ষেত্রেই বা কী নিয়ম?

আমাদের সমাজে হিজড়েদের সম্মান দেওয়া বা ভাল চোখে দেখা হয় না। রাস্তাঘাটে, ট্রেনে তাদের ভিক্ষা করতেই দেখি আমরা। তবে সেই ভিক্ষা অনুনয়ের সুরে নয় কিছুটা গায়ের জোরেই। কোন পরিবারে নবজাতক হলে সেখানেও জোর করে তারা টাকা আদায় করে। এরা বাজার থেকে জোর করে আনাজপাতি তুলে নেয়। অশ্লীল অঙ্গ ভঙ্গি করে।

যেসব সরকারি সুযোগ-সুবিধার কথা আমরা বলতে চাইছি, সে সব ব্যবহার করার সাধ্য বা সামর্থ্য কি তাদের আছে? আপনারা শবনব মুন্সীর নাম শুনেছেন? তিনি মধ্যপ্রদেশের একজন বিধায়ক। শবনম নারী নন, পুরুষও নন। তিনি নারী-পুরুষের মধ্যবর্তী তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ বা উভলিঙ্গ। তবে বৃহন্নলাদের মধ্যে উন্নতি ঘটছে। সম্প্রতি তাঁকে নিয়ে একটি হিন্দি ছবিও তৈরি হয়ে মুক্তি পেয়েছে। আগামী দিনে হয়ত আরও শবনব মুন্সীর দেখা মিলবে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, আমরা যাদের বৃহন্নলা বলি তারা সবাই উভলিঙ্গ বা হিজড়ে নয়। হয় তারা মেয়েলী পুরুষ, নয়ত পুরুষালী মেয়ে। ফলে কোন সরকারি ফর্মে না নথিপত্রে তারা লেখে তাদের ইচ্ছামতো লিঙ্গটি। সাধারণত তাকে দেখে যা মনে হয় সেই লিঙ্গ। কোন জটিলতা নেই এর মধ্যে। তবে বেশিরভাগ উভলিঙ্গ মানুষই সরকারি সুযোগ-সুবিধার প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না। ফলে তারা নারী না পুরুষ এ জাতীয় প্রশ্নের মুখোমুখি হতেও পছন্দ করে না। বেশি প্রশ্ন করলে বিরক্ত হয়। গত জনগণনা অনুযায়ী আমাদের দেশে প্রায় ১২লক্ষ উভলিঙ্গ মানুষ আছে এবার দেখা যাক এদের সম্পর্কে সরকারি সংস্থাগুলির বক্তব্য কী? বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে এ ব্যাপারে দায়িত্বসহ সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন এমন কাউকে পাওয়া যায়নি। তবে রেল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, কোন ব্যক্তি তিনি রেলের রিজার্ভেশন ফর্মে কোন লিঙ্গ লিখলেন তাতে তাঁদের কিছু এসে যায় না। কারণ প্রতিদিন এত মানুষ ট্রেনে সফর করেন যে তাতে অত সময় থাকে না তিনি কোন লিঙ্গের তা দেখার। তাছাড়া নাম দেখেও অনেক সময় বোঝা যায় না তিনি নারী না পুরুষ। বিহন্নলারা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারে কিনা খোঁজ নিতে গিয়ে দেখা গেল দেশের ব্যাঙ্কিং শিল্পের চেয়ারম্যান থেকে অন্যান্য উচ্চপদস্থরাও সঠিকভাবে জানেন না যে উভলিঙ্গরা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারে কিনা। দেনা ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান তথা ম্যানেজিং ডিরেক্টর এম ভি নায়ার প্রথমে বলেছিলেন, বেশ ভাল প্রশ্ন। আমি আপনার সঙ্গে এ ব্যাপারে পরে কথা বলছি। তিনি কথা রেখে জানিয়েছিলেন, বৃহন্নলাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যাপারে এমনিতে কোন বাধা নেই, তবে কখনও শোনা যায় নি কোন উভলিঙ্গ মানুষ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলেছে। পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের চেয়ার ম্যান এস সি গুপ্তা খুব আশ্চর্যের সঙ্গে বললেন, আমি আমার আজীবন ব্যাঙ্কিং কেরিয়ারে এমন ঘটনার মুখোমুখি হইনি কখনও। ব্যাঙ্ক অব বরোদার প্রধান এ কে খান্ডেলওয়ালের বক্তব্য, তিনি ঠিক নিশ্চিত করে বলতে পারছেন না তবে তাঁর ধারণা, বৃহন্নলারা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবে না। এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের মুখপাত্রের বক্তব্য, বৃহন্নলারা যদি তাদের বাসস্থান সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানাতে পারে অ্যাকাউন্ট খুলতে বাধা থাকবে কেন? কিছুটা থেমে তিনি আরও বললেন, অ্যাকাউন্ট খুলবে পুরুষ কী নারী এক্ষেত্রে এটা কোন ব্যাপার নয়। এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত করে কিছু বলার নেই। তবে ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত ব্যাপারে যারা শেষ কথা বলার অধিকারী সেই ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মুখপাত্রের বক্তব্য, এটা সম্পূর্ণরূপেই সেই ব্যাঙ্কের ব্যাপার তারা কোন উভলিঙ্গ মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলবে কিনা। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যাকে বলেছে 'ক্লিয়ার কাস্টমার পলিসি' সেই পদ্ধতির অন্য নাম হল 'কে ওয়াই নর্ম'। গত দশম এ কে মিত্র কমিশন 'নো ইয়োর কাস্টোমার' নামে কিছু নির্দেশ চালু করে। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে গেলে সেই পদ্ধতি মানতেই হবে। না হলে হবে নিয়মবিরুদ্ধ কাজ। তাতে কিন্তু স্পষ্ট দেওয়া আছে নারী বা পুরুষের জন্য আলাদা আলাদা কলাম বা জায়গা। এই প্রসঙ্গে ব্যাঙ্কিং শিল্পের সঙ্গে জড়িত বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছন্দা কোছার বললেন, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার সময় নারী না পুরুষ দেখাটা জরুরি নয়। বরং জরুরি তার বাসস্থানের হদিশ এবং ব্যক্তিগত পরিচিতি। এ ব্যাপারে ডাক বিভাগের বক্তব্য কী? বৃহন্নলরা কি ডাকঘরে টাকা সঞ্চয় করতে পারে? এই প্রশ্নে স্পষ্টতই একটু বিব্রত হলেন ডাক বিভাগের এক মুখপাত্র। তাঁর বক্তব্য, এ ব্যাপারে সরকারি কোন নির্দেশিকার কথা তাঁর জানা নেই। যে কোন ব্যক্তিই ডাকঘরের সুযোগ-সুবিধা অর্থের বিনিময়ে নিতে পারে। দেশের যেকোন ডাকঘরেই অ্যাকাউন্ট খুলতে পারে। এই প্রসঙ্গে পোষ্ট মাস্টার জেনারেল (ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্কেল)-এর অফিসে যোগাযোগ করে জানা গেল একই কথা। ডাকঘরে অ্যাকাউন্ট খুলতে প্রাপ্তবয়স্ক কারোর টাকা জমা দিতে কোন সমস্যা নেই। বৃহন্নলাদেরও নেই। বৃহন্নলারা অত্যন্ত গরীব। তাদের কষ্টার্জিত অর্থ রাখার পক্ষে বরং ডাকঘর অত্যন্ত

আদর্শ ক্ষেত্র। এখন তো জীবন বিমার ব্যবসাতে এসেছে অন্তত ত্রিশটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। জীবন বিমা কর্পোরেশনের এক ডেভেলপমেন্ট অফিসার বিবেক সিংহ জানালেন, বৃহন্নলাদের জীবনবিমা করার কথা তিনি কখনও শোনেননি। তবে নিজে থেকে করতে চাইলে যাতে পলিসি হয় তা তিনি দেখবেন। আর এক ডেভেলপমেন্ট অফিসার সমীরণ রায় মনে করেন, সেই ব্যক্তি নারী না পুরুষ এটা লিখতে হবে। তারপর দেখা যেতে পারে পলিসি খোলা যাবে কিনা। তবে আমার মনে হয় যাবে না। আইএনজি বৈশ্য ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর কৌশিক মিত্র বললেন, খোলা যাবে না এমন কথা কোথাও লেখা নেই। তবে সাধারণত ওরা এগিয়ে আসে না বলেই হয় না। চিকিৎসাজনিত বিমা ব্যবস্থা বা মেডিক্লেমের ক্ষেত্রের কী নিয়ম? ন্যাশনাল ইন্সুরেন্সের মেডিক্লেমের এজেন্সি বেশ কিছু দিন হল নিয়েছেন সমর ঘোষ। কেউ কখনও উভলিঙ্গদের কাছে মেডিক্লেম পলিসি বিক্রি করে নি। যদি একটি দু'টি ক্ষেত্রেও হতে শুরু করে তাহলেই দরজা খুলে যাবে। কিন্তু সাধারণ বিমা কোম্পানী থেকে সদ্য অবসর প্রাপ্ত সুদীপ বটব্যাল জানালেন, মেডিক্লেম উভলিঙ্গদের পক্ষে করা সম্ভব নয় একটি কারণেই যে, তাকে নারী না পুরুষ লিখতেই হবে। যেহেতু তা লেখা ওদের পক্ষে নয় তাই কোন বিমাই বৃহন্নলারা করতে পারবে না। ন্যাশনাল ইন্সুরেন্সের অজয় দত্তগুপ্ত বললেন, এরকম কোন কেস এখনও আসেনি। যদি আসে তখন আমরা ভাবব মেডিক্লেম করা যাবে কিনা। বিভিন্ন সরকারি সংস্থায় কর্তব্যরত ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে বোঝা গেল, উভলিঙ্গদের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন আইন নেই। আইনে সুবিধা বা অসুবিধা নেই। তবে আগামী দিনে হয়ত এই ধরণের কোন আইন তৈরি হতে পারে তখন কোন মানুষ - সে নারী না পুরুষ তার উল্লেখ না করেই সরকারি নানা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবে, যা নিয়ে কোন বিতর্ক থাকবে না, তখনই এই সমাজ আমাদের কাছে প্রকৃত উদার সমাজ হিসাবে গড়ে উঠবে।

হিজড়েদের প্রতিবন্ধী হিসেবে গণ্য করার আর্জি জানাল রাজ্য

পঞ্চপান্ডবের অজ্ঞাতবাসের সময় নপুংসকের বেশে বিরাট রাজার মেয়েকে নাচ শেখানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন বৃহন্নলা। সেই বৃহন্নলা কি আদৌ প্রতিবন্ধী?

আর শিখন্ডী? মহাকাব্যের যে- 'হিজড়ে' কে দেখে ভীষ্ম অস্ত্র ত্যাগ করেছিলেন? তাঁকে প্রতিবন্ধী হিসাবে চিহ্নিত করলে হইচই হবে কি?

এইসব প্রশ্ন রীতিমতো ভাবিয়ে তুলেছিল দিল্লির কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের অফিসারদের। কারণ, পশ্চিমবঙ্গ থেকে আর্জি গিয়েছে, ওঁদেরও প্রতিবন্ধী হিসাবে বিবেচনা করা হোক। কেন এই আর্জি, তা-ও বিস্তারিত ভাবে পেশ করা হয়েছে। কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে দ্বিধায় পড়েছেন কর্তারা।

কেন্দ্রের কাছে পাঠানো চিঠিতে লেখা হয়েছে, সারা দেশে হিজড়ের সংখ্যা প্রায় ১১ লক্ষ, পশ্চিমবঙ্গে ৫০ হাজারের মতো। হঠাৎ এই ধরণের আর্জি কেন? রাজ্যের সমাজকল্যাণ দফতরের এক পদস্থ অফিসার বলেন, ''সম্প্রতি মালদহে একটি প্রতিবন্ধী শিবিরে এক শিক্ষক প্রশ্ন তুলেছিলেন, সাত বছরের স্কুল পড়ুয়া এক হিজড়ে কেন প্রতিবন্ধীর সুযোগ পাবে না? প্রশ্নটা নানাভাবে আমাদের ভাবাতে শুরু করল। মানবাধিকার, ভারতীয় সংবিধানের নানা বিষয় খতিয়ে দেখার পরে কেন্দ্রের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।'' লিখিত আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে মহাভারতের বৃহন্নলা এবং শিখন্ডীর কথাও।

কেন্দ্রের 'কমিশনার ফর পার্সনস উইথ ডিজঅ্যাবিলিটি' বিভাগের এক পদস্থ অফিসার বলেন, ''এই ব্যাপারে

চটজলদি সরকারি সিদ্ধান্ত নিতে অসুবিধা আছে, সংশ্লিষ্ট কল্যাণ-নীতি সমস্যা হচ্ছে বলে অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে তারা ব্রিটেনের লগ্নি সংস্থা ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডি এফ আই ডি)-এর সঙ্গে এক প্রস্থ কথাও বলেছেন। ডি এফ আই ডি-র টাকায় এই ব্যাপারে সমীক্ষার সুপারিশ করা হয়েছে।

জনগণনার সমীক্ষায় প্রতিবন্ধী-সংখ্যার তালিকায় এ রাজ্য ১৩ নম্বরে। অথচ ব্যাঙ্গালোরের একটি সমাজসেবী সংস্থার সমীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গ আছে চতুর্থ স্থানে। ২০০১ জনগণনা অনুযায়ী সারা দেশে এবং পশ্চিমবঙ্গে মোট বাসিন্দারা যথাক্রমে ২.১৩ এবং ২.৩০ শতাংশ প্রতিবন্ধী। অন্য দিকে, জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থা (এন এস এস ও)-র সমীক্ষায় এই দুই হার যথাক্রমে ১.৮ এবং ১.৭ শতাংশ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-র সমীক্ষায় সারা দেশে এই হার পাঁচ শতাংশ। হিসেব নিয়ে বিভ্রান্তি দূর করতে পশ্চিমবঙ্গে প্রতিবন্ধী-শুমারির প্রস্তাব দিয়েছে সমাজকল্যাণ দফতর।

জনগণনার সমীক্ষা অনুযায়ী এ রাজ্যে মোট বাসিন্দা ২.৩০ শতাংশ প্রতিবন্ধী। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার হিসেবে অবশ্য এই হার আলাদা। রাজ্যের প্রতিবন্ধী কমিশনার সুপ্রিয় গুপ্ত বলেছিলেন, ''এর ফলে বিভিন্ন প্রকল্প তৈরীর কাজে অসুবিধা হচ্ছে। প্রতিবন্ধীর মোট সংখ্যা এবং কী ধরণের কত প্রতিবন্ধী, কোন অঞ্চলে আছেন তা জানা গেলে এইসব রূপায়ণে বাড়তি সুবিধা পাওয়া যাবে। এই কারণেই প্রতিবন্ধী-শুমারি চালানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।''

ভারত ও পশ্চিমবঙ্গে প্রতিবন্ধীর হিসেব যাই হোক, স্পেন, নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ায় এই হিসাব যথাক্রমে আট, ১৮ ও ২০ শতাংশ। প্রতিবন্ধী কমিশনার বলেন, ''সমস্যা হচ্ছে প্রতিবন্ধীর সংজ্ঞা নিয়ে। মানসিকভাবে অসুস্থ এবং দেখতে , শুনতে, চলতে কথা বলতে অক্ষম—সরকারি ভাবে নির্দিষ্ট এই পাঁচ ধরণের অক্ষমতা থাকলে তবেই আমাদের দেশে কাউকে প্রতিবন্ধী বলে চিহ্নিত করা হয়। অনেক জায়গায় কুষ্ঠ হলেও প্রতিবন্ধী বলে ধরা হচ্ছে। এই সব বিষয় মাথায় রেখে পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা করতে না পারলে ভবিষ্যতেও নানা বিভ্রান্তি থেকে যাবে।''

রানাঘাটের ভবঘুরে ''রানু মন্ডল'' এখন বিখ্যাত সেলিব্রিটি, তিনি কিভাবে সেলিব্রিটি হলেন?

দেবারতি মিত্র

ভদ্রমহিলাব জন্ম দশই অক্টোবর ১৯৫৯। রানাঘাটের একটি গ্রামে ওরা বাস করতো। কম বয়স থেকেই গান চর্চা করতো , তখন তাঁর নাম ছিল রানু রায় তবে গানের কোন প্রথাগত শিক্ষা ছিল না বলেই জানি। এই প্রতিভাধর মহিলা বিয়ের আগে কিছুদিন একটা নাইট ক্লাবে গান গাইতো তখন তাঁর নাম ছিল রানু ববি। কিন্তু বাড়ির লোকের অপছন্দের কারণে একদিন এই পেশা থেকে সরে এলো। এরপর তাঁর বিয়ে হয় মুম্বাই বাসী বাবলু মন্ডলের সাথে এবং মুম্বাই পাড়ি দেন।

কিন্তু স্বামীর হঠাৎ অকাল মৃত্যুতে উনি অথই জলে পড়লেন। মেয়ে কে নিয়ে আবার রানাঘাটে নিজের বাড়িতে ফিরে এলেন। কিন্তু পেট চলবে কীভাবে ? উপায়ন্তর না পেয়ে শেষে রানাঘাট স্টেশনের প্লাটফর্মে বসে গান গাইতে শুরু করলো , একপ্রকার ক্ষুন্নিবৃত্তি , তাতেই কোন প্রকারে দিন চলতো। এদিকে মেয়ে বড়ো হবার পর মায়ের এই প্ল্যাটফর্মে বসে গান গাওয়া মেনে নিতে না পেরে মাকে ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। তাঁর এই সুরেলা গলায় আকৃষ্ট হয়ে

একদিন অতীন্দ্র চক্রবর্তী নামে এক সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার তাঁর গানের একটা ভিডিও রেকর্ডিং করে সোশাল মিডিয়ায় আপলোড করে , বিস্তর লাইকও পেতে শুরু করে।

এই ভিডিও যখন সনি এন্টারটেইনমেন্ট চ্যানেলের চোখে পড়লো তারা তাদের রিয়ালিটি শোতে আমন্ত্রণ জানালো। অতীন্দ্রই তাঁকে নিয়ে মুম্বাই পাড়ি দেয়। শোতে যাবাব আগে এক বিউটি পার্লারে নিয়ে তাঁকে বিস্তর মাজা-ঘষা চলে , দৈন ভিখারির দশা থেকে কিছুটা মানুষের চেহারায় আনার জন্য। সনির সেই রিয়ালিটি শোতে বিপুল ভাবে প্রশংসিত হন , সেখানে উপস্থিত হিমেশ রেসমিয়া তাঁর গানে মুগ্ধ হয়ে তখনই নিজের একটি ছবিতে তাঁকে দিয়ে একটি গানের রেকর্ড করেন। এরপর অনেক ডিরেক্টরই তাদের ছবিতে রানুর গানের ইচ্ছা প্রকাশ করে।

একটি গান বাবদ হিমেশ তাঁকে সাত লক্ষ টাকা দিয়েছেন যদিও রানু প্রথমে ওই টাকা নিতে অস্বীকার করেন কিন্তু হিমেশ জোর করে সেই টাকা দেন। অতীন্দ্রকে হিমেশ বলেছে রানুদির জন্য একটা ভালো বাসস্থান জোগাড় করে দিতে। রানু রানাঘাটে ফেরার পর দশ বছর আগে মাকে ছেড়ে চলে যাওয়া মেয়ে আবার মায়ের কাছে ফিরে এসেছে।।

এ কেমন ছেলেবেলা

শ্রাবন্তী সাউ, সমাজকর্মী

আমি একজন সমাজকর্মী। আমি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু ও সমাজের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত। এই কাজের সুবাদে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। এরকমভাবেই এক পুলিশ অফিসারের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছিল। একদিন ওই অফিসার আমায় ফোন করেন এবং বলেন আমি যেন ওনার সঙ্গে থানায় দেখা করি। সেদিন ঘন্টা কয়েকের মধ্যেই আমি ওই অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে থানায় গেলাম। ওনার ঘরে যেতেই উনি বসার জন্য চেয়ারটি এগিয়ে দিলেন। উনি আমায় একটি বিষয় দেখার জন্য বলেন। ওই পুলিশ অফিসারের থেকে জানতে পারি উনি দুটি ছেলেকে থানায় নিয়ে এসেছেন। ছেলে দুটি রাস্তায় রাস্তায় ইতস্তত ভাবে ঘুরে বেড়াছিল। এক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা ছেলে দুটিকে সন্দেহ করে স্থানীয় থানায় ফোন করে বিষয়টি জানায়। স্থানীয় থানার পুলিশ গিয়ে ছেলে দুটিকে থানায় নিয়ে আসে। পুলিশ সূত্রে খবর একজনের বয়স ৭ ও আর একজনের বয়স ১৪ বছর। ছেলে দুটির নাম কি? এবং তারা কেন ঘুরে বেড়াছিল? তা পুলিশ তাদের কাছ থেকে জানতে পারেনি। অফিসার আমায় ছেলে দুটির সঙ্গে কথা বলতে বলেন এবং জানতে বলেন ছেলে দুটি কেন এভাবে ঘুরে বেড়াছিলো? আমি ছেলে দুটির সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলে জানতে পারি ছেলে দুটির বাড়ি পূর্ব বর্ধমানের প্রত্যন্ত এক গ্রামে । বাবা বাড়ি থেকে মাকে ও ছেলেদের তাড়িয়ে দিয়েছে। বাবা আবার এক মহিলাকে বিয়ে করেছেন। বাবা তাদের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে। মা ভিক্ষা করে সংসার চালান, ছেলে দুটিও মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষা করে। স্থানীয় এলাকায় ভিক্ষা না পেয়ে তারা শহরে চলে আসে তাদের স্বজাতিদের সঙ্গে। শহরে এসে তারা রাস্তায় ভিক্ষা করে বেড়ায়। তারা সকলে মিলে লাইনের ধারে নির্দিষ্ট একটি জায়গায় রাত্রিযাপন করে। সকাল হলেই সকলে যে যার মতো ভিক্ষা করতে বেড়িয়ে পড়ে। সন্ধ্যের পর সকলে ভিক্ষা করে নিয়ে আসে ওই একই জায়গায়। ভিক্ষার ওই অর্থ দিয়েই তারা চাল, ডাল, আলু কিনে এনে খোলা আকাশের নিচে রান্না করে খায়। তারা দেশের বাড়িতে যেখানে থাকে

সেই ঘরটির চাল ফুটো, বর্ষার জল পরে, তাদের তা ঠিক করার ক্ষমতা নেই, তাই ভিক্ষা করে টাকাও জোগাড় করছিল। ছেলে দুটি আমায় তাদের দিদি মনে করে সমস্ত কথা খুলে বলে। আমি জানতে পারি তারা নিরুপায় হয়েই এক ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। আমি ছেলে দুটির নাম, ঠিকানা সহ সমস্ত তথ্য অফিসারকে জানাই এবং তিনি কালবিলম্ব না করেই শিশু দুটিকে সংশ্লিষ্ট শিশু কল্যাণ সমিতিতে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

আমরা ভিখারী

বিবস্থান মিত্র (পিপলস্ পার্টিশিপেসন)

আমি যে অঞ্চলে থাকি সেখানে জনসাধারণের ব্যবহার করার জন্য একটি পুকুরে প্রায় প্রতিদিনই দেখতে পাই এক বৃদ্ধ ভিক্ষুক দম্পতি প্রতিদিন সকালে ও বিকালে স্নান করে পরিস্কার হতে আসেন।

এই করোনাকালে আমি আমাদের পাওয়া রেশনের চাল ওনাদের দিতে গিয়েছিলাম। ওনারা বলেছিলেন যে, ''আমাদের রান্না করার কোন ব্যবস্থা নেই, সেই কারণে আমরা শুধুমাত্র টাকা-পয়সা, রান্না করা ও শুকনো খাবার ভিক্ষা করে থাকি"।

এরপর আমি এক প্যাকেট মুড়ি আর ৫০০ গ্রাম মুড়কি কিনে দিলে ওনারা সানন্দে তা গ্রহণ করেন। এরপরে আমি ওনাদের নাম জিজ্ঞাসা করাতে ওনারা বলেন যে, ''আমাদের নাম আমরা আজ আর মনে করতে পারি না, ভুলে গেছি।"

আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলাম, ওনারা খুব পরিস্কার থাকতে পছন্দ করেন এবং প্রতিদিন দুবার স্নান করেন। প্রতিদিন বিকেলে তাদের নোংরা পোষাক একটি প্লাস্টিক প্যাকেটের মধ্যে জল ও সাবান-এর মিশ্রনে ডুবিয়ে তা কেচে নেন। বর্ষাকালে কারোর বাড়ির নীচে এবং গ্রীষ্ম ও শীতকালে খোলা আকাশের নীচে বসবাস করে তাদের বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেওয়াই এখন একমাত্র লক্ষ্য। এই দুইজন জানেন না যে, সরকার কাকে বলে, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর নাম কী, ভোট কবে আছে ইত্যাদি বিষয়ে।

ওনারা নিজেদের সম্বন্ধে কোন কিছুই বলতে চান না এবং নিজেদের মধ্যেও কথা কম বলেন। এখন তারা এই অঞ্চলের এই পুকুরের পাশে বসবাস করছেন কিন্তু এর পরে কোথায় যাবেন তারা জানেন না, এখন ভবঘুরে জীবনে মুক্তির আনন্দ তাঁদের শান্তি দিয়েছে।

এখনো স্বভাবে কখনো অভাবে - ভিক্ষাবৃত্তি একটি সামাজিক ব্যাধি ও তিন কাহন্

হিমাংশু দাস, সমাজকর্মী

ভিখারী শব্দটি মনে আসলেই কয়েকটি আবছা ছবি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। দীন দরিদ্র অবস্থা, বয়স্ক হত-দরিদ্র, জীর্ণ জামাকাপড়, কখনো কখনো বিশেষভাবে সক্ষম মানুষজন যারা একটি ভিক্ষাপাত্র এগিয়ে দিচ্ছেন এই বলে 'বাবু

একটি টাকা দেবেন' অথবা একটু খাবার! কখনো বলছেন 'বাবু দুদিন ভাত খাইনি ভাত খাবার পয়সা দেবেন'। কোলে বাচ্চা নিয়ে অল্প বয়সি মা বসেছেন ভিক্ষা করতে পথের ধারে, রেল স্টেশনে, এখন আবার ট্রেনের কামরাতে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করতে দেখা যায়। কখনো সেই মা বলে 'বাচ্চাটি খাইনি সারাদিন' আবার কখনো বলে 'বাচ্চাটা অসুস্থ পয়সা না পেলে চিকিৎসা হবে না'। ট্রেনে-বাসে হসপিটালের কাগজ দেখিয়ে, রোগগ্রস্থ শরীরটাকে দেখিয়ে পয়সা থুরি টাকা চাওয়া (ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে) সবই ভিক্ষাবৃত্তির অঙ্গ। কেউ কেউ প্রশ্ন করেন ট্রেনে বা বাসে যারা গান গেয়ে টাকা চায় খুব বিনীত ভাবে, বানজারা বা বেদ সম্প্রদায়ের ছোট ছেলে মেয়েরা কসরত দেখিয়ে পয়সা চায় তারা কী ভিখারী নয়? হ্যাঁ এ এক প্রশ্ন বটে।

ভিক্ষারি শব্দটি সংস্কৃত ভিক্ষুক (ভিক্ষু + ক) থেকে এসেছে। ভিক্ষুক শব্দের অর্থ হল ভিক্ষা যিনি চান বা দয়া যিনি প্রার্থনা করেন বা দরিদ্র ও নিঃস্ব ব্যক্তি যিনি অন্য ব্যক্তির কাছে অর্থ খাদ্য ইত্যাদি দয়ার দান চান তিনি ভিখারী। আর ভিক্ষা বলতে বুঝতে হবে দয়ার দান-কে।

ভারতে বিভিন্ন ধর্মে দানের কথা বলা আছে। হিন্দু সনাতন ধর্ম, মুসলিম ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম প্রভৃতিতে দানের প্রসঙ্গ রয়েছে। পক্ষান্তরে ভিক্ষা শব্দটির ব্যবহার বহুল প্রচলিত। সুতরাং ভিক্ষা বা ভিখারী শব্দটি আমাদের কাছে অপরিচিত নয়। আর দুশো বছরের ব্রিটিশ শাসন আমাদের এই বৃত্তির কথা বেশি করে স্মরণ করায় কারণ নিজেদের দেশেই তারা আমাদের ভিখারী করে দিয়েছিল।

যাইহোক এককথায় ভিক্ষার দ্বারা জীবিকা নির্বাহকারী হলেন ভিক্ষুক।

ভিক্ষা চাওয়ার মাধ্যম ও জায়গা ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। ভারতীয় তীর্থ স্থানগুলিতে বসে (সব ধরণের ধর্মীয় স্থানে) যাঞ্চা বা ভিক্ষা করা প্রচলিত ও প্রাচীন ভিক্ষা পদ্ধতি। ট্রেনে বাসে গ্রামে-শহরে ঘুরে ঘুরে ঈশ্বরের নামে ভিক্ষা প্রার্থনা করা বা শুধু গান গেয়ে আবার গান না গেয়ে ভিক্ষা প্রার্থনা করা ভিক্ষাজীবিদের-ও প্রাচীন ভিক্ষুকদের দলে ফেলা যায়।

কোলে ছোট্ট বাচ্চা নিয়ে ভিক্ষা চাওয়া ভিখারী মা-এও একধরনের ভিক্ষা পদ্ধতি। ইদানিং একটু কম দেখি সাদা থান পড়ে কম বয়সি ছেলেদের ভিক্ষা চাওয়া। আসলে কোলে ঘুমন্ত / অসুস্থ বাচ্চা, সাদা থান, রোগগ্রস্থ শরীর প্রদর্শন, গান গাওয়া, কসরত দেখিয়ে টাকা-পয়সা চাওয়া সবই ভিক্ষা ব্যবসার ইকুইপ্টমেন্ট বা উপকরণ। ভিক্ষাবৃত্তি আসলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জীবিকা অর্জনের জন্য একটি কম পরিশ্রমের অবলম্বন মাত্র। বোঝাই যাচ্ছে যে ভিক্ষা করার অনেক পদ্ধতি রয়েছে ও কৌশল আছে। আসলে এই কথাগুলি বলার পিছনে অর্থ হল এই যে সাধারণ মানুষ ভিক্ষা হিসাবে যে দানটি করে তা ভিক্ষা প্রার্থীর মঙ্গলহেতু কিংবা বলা যেতে পারে নিজের পুন্য অর্জনের জন্য বা সামাজিক মানুষ হিসাবে কর্তব্যের খাতিরে। আপনি যে ভাবে পারেন ভাবতে পারেন। কিন্তু ভিক্ষাজীবি মনে করে এটাই তার উপায়ের মাধ্যম, কারবার, কাজের জায়গা। তিনি মানসিকতার অভাবে অন্য কোনো এর চেয়ে কঠিন কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে চান না পারেন না। অনেক সময় ভিক্ষাজীবিদের নিপুণ অভিনয় যে কোনো বড় অভিনেতাকে হার মানাবে। যে যত ভালো কৌশল আয়ত্ত করতে পারে তার উপায় তত বেশি।

ভিক্ষাজীবিদের কারবার তাদের সমাজের বুকে নিয়ন্ত্রিত ব্যবসা। বিভিন্ন শহরের ট্রাফিক সিগনাল ক্রসিং-এ, পার্কের পাশে, মন্দির চত্তরে, ধর্মীয় জায়গায় প্রভাবশালীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ব্যবসা চলে বলে অনেকে মনে করেন। যদিও এই তথ্য কতটা ঠিক তা মূল্যায়ন করা যায়নি, তবে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে, চলচ্চিত্রে এর উল্লেখ রয়েছে।

এতকিছু আলোচনার মাঝে যে কথাটি রয়েছে সেটি হল ভিক্ষাবৃত্তি কী কোনো মানসিক ব্যধি? ঠিক তাই এটি মানসিক ব্যধির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ব্যধিও বটে। আসলে সমাজে যখন শিক্ষা মূল্যবোধের ক্ষয় হতে থাকে, মিশ্র অর্থনীতিও যখন ভোগ-বিলাসের পন্থাকে অবলম্বন মনে করে, আদর্শের বিনাশ হয় তখন চুরি-ডাকাতি-ঠকানো কারবার, ভিক্ষাবৃত্তি বৃদ্ধি পায়। দেশে মুদ্রাস্ফীতি হার অনিয়ন্ত্রিত থেকে যায় তখন মানুষের জীবন যাপনের মান পড়তে থাকে। এটি একটি আপাত দৃষ্টিতে জটিল মনে হলেও যৌগিক প্রক্রিয়া। তবে প্রশ্ন হল এটি থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় কী একেবারেই নেই। নিশ্চয় আছে তবে সেটি এক দিনে হবে না। মনে রাখতে হবে এটি একটি মনস্তাত্বিক আর্থ-সামাজিক প্রক্রিয়া। উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে গতানুগতিক শিক্ষাকে সরিয়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে প্রাধান্য দেবে এর সঙ্গে চাহিদা অনুসারে কর্মসংস্থান হবে যা একে অপরের পরিপূরক তখন এই ব্যাধি কমার প্রবণতা দেখা দেবে। আর এর সঙ্গে সঙ্গে এই বৃত্তিকে ঘৃণার চোখে দেখার অভ্যাস করতে হবে, আইনের শাসন, সার্বিক উন্নয়ন, অভ্যাসের পরিবর্তন অর্থাৎ পরিশ্রম বিনা নাগরিক সুবিধা না মেলা, অর্থনৈতিক কাঠামো পুনঃগঠন, সামাজিক প্রকল্পগুলির সঠিক রূপায়নে, ছোট-বড় সকল রকম কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে ভিক্ষা বৃত্তির অবসান সম্ভব।

পরিশেষে তিনটি উদাহরণ দিতে চাই, তিন ধরনের ব্যক্তি যারা ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত।

১. প্রায় ১৪-১৫ বছর আগের কথা, একজন শিক্ষিত, ধোপদুরস্ত নিপাট হিন্দীভাষী ভদ্রলোক, সন্ধ্যা ৭টার দিকে একটি মেট্রো ষ্টেশনে আমার দিকে এলেন। বয়স ২৭-৩০ বছর হবে। নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন তিনি একজন গৃহশিক্ষক, সুভাষনগর যাবেন। তার খুব রেপুটেশন রয়েছে, দুর্ভাগ্যবশত তার কাছে টাকা ফুরিয়ে গেছে। বাড়ি ফেরার জন্য যদি শ-দুয়েক টাকা তাকে দিই তো তিনি বাড়ি ফিরতে পারবেন।

দুঃখ লাগল মেট্রো স্টেশনের প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে একজন এইভাবে বাড়ি ফেরার জন্য তখনকার দু-শ টাকা চাইছেন।

২. বছর ১৫-১৬ বছরের একটি ছেলে হৃদয়পুর স্টেশনে সন্ধ্যাবেলা হাতে একটি ছোট বাজারের ব্যাগ নিয়ে ভিক্ষা চাইছে। বললাম আমি কিন্তু তোমাকে পুলিশে ধরিয়ে দেবো, দাঁড়াও চাইল্ড লাইনে খবর দিচ্ছি, এখুনি বাড়ি ফিরে যাও আর কোনো দিন ভিক্ষা চাইবে না। না ফল কিছু হল না। প্লাটফর্ম বদল হল মাত্র।

৩. 'দু-টাকা দেবেন, খাবার খাবো'। মানসিক ভারসাম্যহীন ভিখারী, মাঝে মাঝে দেখা পাবেন বারাসাত স্টেশনে। দোকানদার, সাধারণ লোকে এনাকে সাধ্যমতন খাবার খাওয়ায়।

না সমাজ সংস্কারক আমি নই, আমি একজন সাধারণ সমাজকর্মী। পরিকল্পনা নেওয়া ও রূপায়ণের জন্য নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ রয়েছে যারা উন্নয়ণ করার জন্য নির্বাচিত হন। বাকি ভাবনটা তাদের ওপর রইল। যদি সাহায্য লাগে তখন জানাবেন। ততদিন পর্যন্ত আমার ছুটি। কারণ সমাজে অনেক কিছু আমাদের চোখের সামনে ঘটে, সব কিছু আমরা দেখেও দেখিনা।

আনন্দবাজার পত্রিকা

বৃহন্নলারা কতটা বঞ্চিত, দেখাল 'দুয়ারে সরকার'

চন্দ্রপ্রভ ভট্টাচার্য্য

দীর্ঘদিন ধরে বিস্তর হইচইয়ের পরে কাগজে-কলমে তাঁদের স্বীকৃতি-সম্মানের ব্যবস্থা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টেরও নির্দেশ, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের জন্য সব ধরনের সরকারী সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু ওই শ্রেণীর মানুষজন সমাজে এখনও কতটা 'একঘরে', চাক্ষুষ করলেন প্রশাসনিক আধিকারিকেরা। 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচিতে বীরভূম জেলা প্রশাসন ওঁদের দুর্দশার যে-ছবি দেখেছে, সব জেলাকেই তা জানিয়ে ব্যবস্থাগ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য।

সরকারি শিবিরগুলিতে তাঁদের দেখা যাচ্ছিল না। তাই 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচীতে আহ্বান জানিয়ে জেলা আধিকারিকেরা ফোন করেন বৃহন্নলাদের। কিন্তু ফোনটি আদৌ সরকারি, নাকি ভুয়ো— প্রশ্ন তোলে বোলপুরে বৃহন্নলাদের অন্য দল! ঠিক হয়, আধিকারিকেরা সরাসরি গিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা বলবেন। অভাব-অভিযোগ বুঝে পদক্ষেপ করা হবে। পরে আধিকারিকেরাই রামপুরহাটে বৃহন্নলাদের পাড়ায় গিয়ে পরিষেবা নিশ্চিত করেন। অফিসার মহলের বক্তব্য, এই অভিজ্ঞতা তাঁদের কাছে নতুন, বৃহন্নলাদের কাছেও বিষয়টি বিস্ময়ের। বীরভূম প্রশাসনের এই পদক্ষেপ সব জেলায় দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নবান্ন।

জেলা প্রশাসন জানাচ্ছে, সব দফতরের কর্মী-অফিসারেরা রামপুরহাটের বৃহন্নলাপাড়ায় গিয়ে দেখেন, সেখানকার অধিকাংশ বাসিন্দা সরকারি পরিষেবার আওতায় বাইরে রয়ে গিয়েছেন। ওই পাড়ার ৩৫-৫৫ বয়সি ১১ জন বৃহন্নলার এক জন বধির, অন্য এক মূক ও বধির। তাঁদের প্রতিবন্ধকতার শংসাপত্র নেই। ফলে তাঁরা সরকারের 'মানবিক' প্রকল্পের বাইরে। তাঁদের এক জনের আরকেএসওয়াই-১ এবং দুজনের আরকেএসওয়াই-২ ডিজিটাল রেশন কার্ড থাকলেও বাকিদের নেই। কেউ কেউ তফসিলি জাতি বা 'ওবিসি'- তালিকাভুক্ত, কিন্তু জাতি শংসাপত্র না-থাকায় 'তফসিলি বন্ধু'র মতো প্রকল্পের সুবিধা পান না। স্বাস্থ্যসাথীর আওতার বাইরে সকলেই। আবাস প্রকল্পেও তাঁদের জায়গা হয়নি। এই সব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে পরিষেবা নিশ্চিত করছেন আধিকারিকেরা।

জেলা প্রশাসনের এক কর্তা জানান, সরকারি সুযোগ সুবিধা যে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষেরাও পেতে পারেন, সেটা এত দিন সংশ্লিষ্টদের বিশ্বাসই করানো যায়নি। চির অবহেলিত এই মানুষগুলির মধ্যে তাই প্রশাসনিক শিবিরে যাওয়ার ইচ্ছা-ভরসা তৈরি হয়নি। ''এ বার সরাসরি দুয়ারে পৌঁছে তাঁদের জড়তা কাটিয়ে পরিষেবা দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করব আমরা,'' বলেন ওই কর্তা। নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, ''মুখ্যমন্ত্রী তৃতীয় লিঙ্গ এবং সমাজের বঞ্চিত অংশের মহিলাদের কাছে প্রশাসনকে পৌঁছানোর নির্দেশ দিয়েছেন। এই উদ্দেশ্যে ৮ ডিসেম্বর উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতায় বিশেষ শিবির করা হবে। একই ব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জেলাগুলিকে''।

রাজ্যে তৃতীয় লিঙ্গের ক'জন মানুষ আছেন, তার সুনির্দিষ্ট হিসেবই নেই। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, ওই শ্রেণীর কমবেশি ১১ হাজার মানুষ ডিজিটাল রেশন কার্ডের জন্য আবেদন করেছিলেন। সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার হিসেবে, রাজ্যে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের সংখ্যা অন্তত ২০ হাজার সংশ্লিষ্ট মহলের বক্তব্য, প্রকৃত সংখ্যা অজানা বলেই তাঁদের পরিষেবার বিষয়টি নিয়েও প্রশ্ন থেকে যায়।

আধিকারিক মহল জানাচ্ছে, এই কর্মসূচি নিয়ে রাজনৈতিক চাপান-উতোর থাকতেই পারে। উঠতে পারে নানা প্রশ্ন। তার মধ্যেই এই ধরণের পদক্ষেপ সমাজের বঞ্চিত অংশের সব মানুষকে চিহ্নিত করে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া গেলে সেটাই হবে সব চেয়ে বড় সাফল্য।

ডাকঘরে ভিক্ষুকদের জন্য টাকা জমা রাখবেন বৃদ্ধ নিখিল

গৌতম ধোনি-চাপড়া

ডাক এলেই এই ভুবন ছেড়ে চলে যেতে হবে। তার আগে উত্তরসুরিদের জন্য পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করে যেতে চান নদিয়ার নিখিল সাহা। দাতা-গ্রহীতার কেউই অবশ্য রক্তের সম্পর্কে আত্মীয় নয়। স্রেফ পথের ভিখারী। তবু তাঁদের জন্য ডাকঘরে এমআইএস। যাতে তাঁর অবর্তমানে মাসিক আয় প্রকল্পের সুদ পান পরম আত্মীয়রা।

হর্ষবর্ধনের মত সর্বস্ব দিয়ে নয়, তবু ২০০ ভিখারীর জন্য 'দাতাকর্ণের' খয়রাতি শুরু পাঁচ বছর আগে। ভিক্ষাজীবীদের সচিত্র পরিচয় পত্র তৈরি করে দিয়েছেন নিজের খরচায়। ব্যাঙ্কের লেজারের মতো বাঁধানো খাতায় রাখা দান গ্রহীতাদের হিসেব। বাংলা মাসের প্রথম রবিবার ব্যবসা বন্ধ রেখে ভিক্ষাজীবীদের হাতে নিখিল তুলে দেন টাকা। প্রতি মাসে মাথা পিছু দশ টাকা।

নদিয়ার চাপড়ার শ্রীনগর মোড়ে বাস রাস্তার গায়েই বৃদ্ধর বাড়ি। বাড়ি লাগোয়া দোকান। সিমেন্টের ডিলারশিপ আছে। একাধিক কোম্পানির সিমেন্ট বিক্রি করেন। কয়েক বছর আগেও আধুলি বা সিকি দিয়েছেন। আর পাঁচটা দোকানদার যে ভাবে দেন প্রতি রবিবার। কিন্তু ২০১১ সালের কোন এক সকালে বদলে গেল নিয়মটা। কী ভাবে? সেটাই শোনাচ্ছিলেন নিখিল। 'একদিন কয়েকজন ভিক্ষাজীবী এলে আমি তাঁদের হাতে খুচরো পয়সা দিতে যাচ্ছিলাম, সেদিন দোকানে হাজির থাকা আমার স্ত্রী বলল, এ ভাবে প্রতি রবিবার সামান্য পয়সা না দিয়ে মাসে একবার চার সপ্তাহের পাওনা যা হয় দিতে পারো। তার থেকে একটু বেশিই দিও।' স্ত্রী-ই আমার চোখ খুলে দিল। কিন্তু, সচিত্র পরিচয়পত্র, লেজার বুক বা চিত্রগুপ্তের খাতা এ সবের কী দরকার? কেনই বা আধুলি বা একটাকার বদলে মাথাপিছু দশ টাকা? উত্তরে বৃদ্ধ বললেন, 'স্ত্রীর কথা শুনে ওই রাতেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি বাংলা মাসের প্রথম রবিবার অর্থ সাহায্য দেব ওদের হাতে। প্রতি মাসে মাথা পিছু দশ টাকা। কোনও ভিক্ষাজীবী হয়তো কোনও মাসে আসেননি, আবার অসৎ মনের কেউ দু'বার অর্থ সাহায্য নিতে পারেন। সেই আশঙ্কায় দোকানের কর্মচারীদের নিয়ে ওদের জন্য তৈরি করানো হয়েছে সচিত্র পরিচয়পত্র। দানের হিসাব লেখা থাকে লেজার বুকে।'

নিখিলবাবু বয়স বিরাশি। আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল। দানপর্ব পাঁচ বছর ধরে সফল ভাবে চলার পর এখন অশীতিপর বৃদ্ধের হঠাৎ মনে হয়েছে, তাঁর অবর্তমানে কী ভাবে চালু রাখা যায় এই প্রয়াস। তাঁর কথায়, 'বয়স হয়ে গেছে। শরীর তো আর আগের মতো চলে না। তা ছাড়া একদিন না একদিন পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। তখন ওদের কী হবে? ওদের জন্যই ভাবছি লাখ চারেক টাকার একটা এমআইএস করব। বিশ্বস্ত কয়েকজনকে নিয়ে একটা কমিটিও করে দেব যাতে আমার অবর্তমানে এই ধারাটি সচল থাকে।'

লক্ষীগাছা গ্রামের মায়া বর্মন। বৈষ্ণব হয়ে এখন মায়া বৈরাগী। বছর তিনেক আগে সঙ্গী বৈষ্ণবটি দেহ রেখেছেন। মায়াও এখানে আসেন। দান গ্রহণ করেন। আবার দু'হাত তুলে নিখিলের জন্য মহাপ্রভুর কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। কলিঙ্গ গ্রামের ৬৫ বছরের বৃদ্ধা স্নেহলতা ঘোষ বললেন, 'ছেলে থাকলেও দেখে না। তাই পথে নামতে হয়েছে। রোজ রোজ দরজায় না এসে, মাসের নির্দিষ্ট দিনে সাহায্য মেলায় শারীরিক পরিশ্রম কমেছে।' চাপড়া দাসপাড়ার দৃষ্টিহীন শৈলবালা বললেন, 'নিখিলের মত আরও কয়েকজন যদি এভাবে আমাদের দুঃখটা বুঝতেন তা হলে অবস্থাটা একটু পাল্টাতো।'

শুধু দানছত্র নয়, ফি-বছর কালীপূজোয় চাপড়ায় নিখিল সাহার বাড়ীতে ডাক পড়ে ওঁদের। পুজোর খিচুড়ি প্রসাদ খাইয়ে শেষে নতুন জামাকাপড়ও দেন তাঁদের। মৃত্যুর আগে এমআইএস করে ওদের ভবিষ্যৎ আর একটু ভালো করতে চান।

ভিখারিদের মুক্তাঞ্চলে মলিন শহরের ভাবমূর্তি

দিল্লিতে ভিখারীদের কর্মসংস্থানে উদ্যোগী আপ সরকার, সমস্যা জেনেও উদাসীন বাংলা

তাপস প্রামাণিক

কলকাতা কি ক্রমেই ভিখারিদের মুক্তাঞ্চল হয়ে উঠছে?

শহরে ভিখারির সংখ্যা ক্রমে বেড়ে চলায় অনেকের মনেই এই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছাপূরণে কলকাতাকে লন্ডন বানাতে শহর জুড়ে চলছে সৌন্দর্যায়নের কাজ। ব্রিজের গায়ে নীল-সাদা রং, সুদৃশ্য মিডিয়ান স্ট্রিপ, পেভার ব্লক দিয়ে মোড়া ফুটপাথ, রাস্তার পাশে সাজানো বাগান— দ্রুত বদলাচ্ছে শহরের চেহারা। সেই সাজানো শহরেই ভিখারির সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। ফুটপাথ, রাস্তার ক্রসিং, চলন্ত বাস, ট্রাম, ট্রেন, লঞ্চ—সর্বত্রই অনেককে দেখা যাচ্ছে ভিক্ষা করতে। ভিক্ষাবৃত্তির নামে জুলুমবাজিও চলছে কোথাও কোথাও, এমনই অভিযোগ। তার জেরে মলিন হচ্ছে মহানগরের ভাবমূর্তি।

রাজধানী দিল্লিকে ভিখারি-মুক্ত করতে সম্প্রতি উদ্যোগী হয়েছে আম আদমি পার্টির সরকার। ভিখারীদের জন্য বাসস্থান তৈরি এবং তাঁদের কমসংস্থানের পরিকল্পনাও করেছে দিল্লির সমাজকল্যাণ দপ্তর । চলতি মাসেই দিল্লিতে ভিখারী সরানোর কাজ শুরু হচ্ছে। তাতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে দিল্লি পুলিশ। পুলিশ এবং সরকারি আধিকারিকদের নিয়ে গঠিত হয়েছে সাতটি দল। তারাই রাস্তা থেকে ভিখারিদের তুলে নিয়ে গিয়ে শেল্টারে পৌঁছে দেবে। বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য তাঁদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণও দেওয়া হবে। মূলত বিদেশী পর্যটকদের কাছে দিল্লির ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতেই এই প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু কলকাতায় সেই ভাবনা-চিন্তা এখনও দূর অস্ত। ঝুপড়িবাসী এবং পথশিশুদের কল্যাণে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে রাজ্য সরকার। এগিয়ে এসেছে এনজিও'রাও। কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধে সরকারি বা বেসরকারি, কোনও স্তরেই কোনও উদ্যোগ নেই, ফলে তিলোত্তমা কলকাতা ক্রমেই ভিখারিদের মুক্তাঞ্চল হয়ে উঠেছে।

শহরে বেড়ে চলা ভিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে চলা চাঞ্চল্যকর তথ্য 'এই সময়'—এর হাতে এসেছে। একটা সময় পর্যন্ত অভাবের তাড়নাতেই মানুষ ভিক্ষাবৃত্তিকে বেছে নিতেন। কিন্তু এখন ভিক্ষাবৃত্তিতেও পেশাদারিত্ব এসেছে। ভিখারি জোগান দেওয়ার জন্য রীতিমতো গজিয়ে উঠেছে পেশাদার এজেন্সি। তাদেরই অন্যতম 'পথশিশু'। সংস্থার বয়স পাঁচ বছরের উপরে। যাদের কাজ হল, গ্রাম থেকে দরিদ্র পরিবারের শিশুদের শহরে এনে ভিক্ষাবৃত্তির কাজে লাগানো। সকালে গ্রাম থেকে এনে রোজ সন্ধ্যায় আবার বাড়ির লোকেদের হাতে পৌঁছেও দেয় এজেন্সির লোকজন। তার বিনিময়ে মাথাপিছু ২৫-৩০% কমিশন পায় এজেন্সি। কলকাতার ভিখারিরা রোজ গড়ে

১৫০-২০০ টাকা পর্যন্ত আয় করেন। তবে পার্ক স্ট্রিটের মতো শহরের কিছু অভিজাত এলাকায় এই আয়ের পরিসংখ্যান দৈনিক ৪০০-৫০০ টাকা পর্যন্ত পৌঁছয়।

এজেন্সির লোকেদের কাজ থেকেই জানা যাচ্ছে, ভিক্ষাবৃত্তির পেশায় শিশুদের চাহিদা সবথেকে বেশি। শিশুদের প্রতি মানুষের সহানুভূতি বেশি। তাই তাদের উপার্জনও বেশি। সদ্যোজাত শিশুদেরও এই কাজে ব্যবাহর করা হচ্ছে। পার্ক স্ট্রিট, ময়দান, রবীন্দ্রসদনের মতো অভিজাত এলাকায় রাস্তার ক্রসিংয়ে এই ধরনের সদ্যোজাতকে নিয়ে অনেক মহিলাকে ভিক্ষা করতে দেখা যায়। বেশিরভাগ শিশুই কিন্তু ভাড়া করা। রোজগারের পথ খুঁজে না পেয়ে বৃহন্নলারাও শহরের রাস্তায় নেমে পড়েছেন ভিক্ষাবৃত্তিতে। কলকাতার প্রায় অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড়ে বৃহন্নলাদের ভিখারীর বেশে দেখা যাচ্ছে। গাড়ি থামিয়ে জোর করে টাকা আদায়ের ঘটনাও ঘটছে। এ নিয়ে তিতিবিরক্ত গাড়ি চালক-আরোহীরা।

শিয়ালদহ এবং হাওড়া ডিভিশনের বিভিন্ন লোকাল ট্রেনেও ভিখারীর সংখ্যা অত্যধিক বেড়ে গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে দৃষ্টিহীন এবং শিশুদের সংখ্যা চোখে পড়ার মতো। এঁদের বেশির ভাগই দমদমের একটি এজেন্সির নথিভুক্ত পেশাদার ভিখারি বলে জানা যাচ্ছে। গান গেয়ে ভিক্ষাবৃত্তির তালিমও দিয়ে থাকে কোনও কোনও এজেন্সি।

এরকম ভিখারিদের পুনবার্সনের কথা ভেবেছে দিল্লির আপ সরকার। কিন্তু এ রাজ্যে সে রকম কোনও উদ্যোগ চোখে পড়ছে না। রাজ্যে সমাজকল্যাণ দপ্তরের এক শীর্ষ কর্তা স্বীকার করেছেন, নিরাশ্রয় মানুষদের জন্য কলকাতা শহরে একাধিক নাইট শেল্টার বানানো হয়েছে। ভবঘুরেদের জন্য 'ভ্যাগাবন্ড শেল্টার' রয়েছে। কিন্তু ভিখারিদের জন্য কোথাও সরকারি প্রকল্প নেই।

কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য, 'ফুটপাতে ভিখারি থাকাটা শহরের পক্ষে মোটেও সম্মানজনক নয়। তবে এটাও ঠিক, আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণেও অনেকে ভিক্ষাবৃত্তি বেছে নেন। সব দিক ভেবে-চিন্তেই সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। রাতারাতি, সেটা সম্ভব নয়'।

লালবাজারের এক শীর্ষ কর্তা জানাচ্ছেন, ভিখারিরা শহরের নিরাপত্তার পক্ষেও বিপজ্জনক। তাঁদের পরিচয় সম্পর্কে পুলিশের কাছে কোনও খবর থাকে না। ফলে ভিআইপি মুভমেন্টের ক্ষেত্রে পুলিশকে সব সময় চিন্তায় থাকতে হয়। অনেক সময় ভিখারিদের সরিয়ে দিতে হয়। যে ভাবে জঙ্গি হামলার আশঙ্কা বাড়ছে তাতে শহরের নিরাপত্তার খাতিরে পার্ক স্ট্রিটের মতো কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাকে অবিলম্বে ভিখারি-মুক্ত করা দরকার বলে মনে করছেন পুলিশকর্তারা।

খসল 'ভিখারি'র দগদগে ঘা— হাসছেন পুণ্যার্থীরা

শুভাশিস ঘটক, গঙ্গাসাগর

মেলার মাঠে জোর কাজিয়া।

এক 'ভিখারি'র সঙ্গে আর এক 'ভিখারি'র রীতিমতো হাতাহাতি। চর-থাপ্পড়-কিল-ঘুষি। ভাঙা মেলায় তা দেখতেও ভিড়। কেউ থামাচ্ছে না। মারামারি বাড়ছে। এক 'ভিখারি'র হাত থেকে খসে পড়ছে দগসগে ঘা, মুখ থেকে বড় আঁচিল, হাঁটু থেকে ব্যান্ডেজ। হাসছে সবাই।

মুখ শুকিয়ে গিয়েছে উত্তর দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরের উত্তম মোহন্তের। ১১ বছরে এই প্রথম তেমন ভিক্ষা

মিলল না। ''এবার মেক-আপটাতেই গন্ডগোল হয়ে গেল। প্রতিদিন আড়াইশো টাকা খরচ। কিন্তু তেমন ভিক্ষা মিলল না। লোকজন ঘা-টা দেখেই সরে পড়ছে''— 'ভিখারি' সাজ নিয়ে বেজায় আক্ষেপ উত্তমের গলায়। গঙ্গারামপুরে মুদির দোকানে কাজ করেন। ২০০১ সাল থেকে মেলায় আসছেন। কখনও পাগল সেজেছে কখনও প্রতিবন্ধী। টাকাকড়িও খারাপ মিলছিল না। এবার ভিখারির সাজ নিয়ে প্রথম থেকে তাঁর সঙ্গে বিবাদ বেঁধেছিল স্যাঙাত জনার্দন মোহন্তের। জনার্দন দিনমজুরি করেন। এ বার যে এতটা গচ্ছা যাবে, ভাবতে পারেননি। তাই উত্তমের সঙ্গে ভাঙা মেলায় কাজিয়া।

উত্তম-জনার্দনেরা তেমন 'উপার্জন' করতে না পারলেও 'পুণ্যার্জন'-এর লোভে শনিবারও মানুষের বেজায় ভিড় সাগরমেলায়।

চাকদহের রাইসেনা নাথ অবশ্য 'পুণ্যের' জন্যে মেলায় আসেন না। ১৮ বছর ধরে স্বামী জিতেন নাথকে নিয়ে তিনি আসছেন কপিল মুনির কাছে 'শান্তি' চাইতে। সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত মন্দিরেই বসে থাকেন। আর চোখের জল ফেলেন। তাঁর মনে পড়ে যায় ছেলেমেয়েদের কথা।

চার ছেলে এক মেয়ে, স্বামী, শাশুড়িকে নিয়ে সুখের সংসার ছিল রাইসেন দেবীর। নিয়ম করে প্রতি মকরসংক্রান্তিতে পিঠেপুলি বানাতেন। ১৮ বছর আগে সেই পিঠেপুলি খেয়ে বিষক্রিয়ায় তাঁর ছেলেমেয়ে এবং শাশুড়ির মৃত্যুর হয়। স্বামীর ফিরতে দেরি হওয়ায় তিনি না খেয়ে বসেছিলেন। তাই আর নিজের বানানো পিঠেপুলি খাওয়া হয়নি। চোখের সামনে ছেলে-মেয়ে, শাশুড়িকে অসুস্থ হয়ে পড়তে দেখেন। হাসপাতালেও নিয়ে যান। কিন্তু কাউকে বাঁচাতে পারেননি। তার পরেই স্বামীকে নিয়ে ঘর ছাড়েন রাইসেন দেবী। দম্পতি এখন থাকেন বেহালার একটি আশ্রমে।

''আমারই তৈরি পিঠেপুলি খেয়ে ওরা মারা গেল। নিজেকে সব সময় দোষী মনে হয়। শান্তি পাই না। তাই প্রতি বছর মকরসংক্রান্তিতে এখানে আসি। ঠাকুরকে বলি, আমাকে শাস্তি দাও''— কেঁদে ফেলেন সন্তানহারা মা। জিতেনবাবু সান্ত্বনা দেন। স্ত্রীকে নিয়ে এগিয়ে চলেন ছাউনির দিকে।

মেলা প্রাঙ্গণ ছেড়ে কাকদ্বীপের বিধান দাস শনিবার সকালে লট-৮-এ চলে গেলেন ছেলে কাজলকে ছাড়াই। একরাশ বিরক্তি নিয়ে। স্নান, পুজো মেলায় ঘোরা— বেশ চলছিল। সন্ধ্যায় 'নিরুদ্দেশ' হয়ে যান কাজল। পুলিশকে জানান বিধানবাবু। মাইকে ঘোষনাও হয়। শনিবার সকালে বিধানবাবু জানতে পারলেন ছেলে পুলিশের জিম্মায়। পকেটমারির অভিযোগে ধৃত।

আর থাকেননি বিধানবাবু। ছেলের জন্য তাঁকে মানসম্মান 'খোয়াতে' হল। তিনি বিরক্তি নিয়ে ফিরলেও, তাঁর সঙ্গে পা মেলানো হাজার হাজার পুণ্যার্থীর মুখে অবশ্য কোনও বিরক্তির ছাপ ছিল না। তাঁদের মুখে ছিল 'পুণ্য' সঞ্চয়ের আনন্দ।

ভিখারীকে নিয়ে

বিমলেন্দু গুহ (মম্‌পাপা ফাউন্ডেশন)

আমি যে এলাকায় থাকি অর্থাৎ এই প্রান্তে প্রতি বুধবার একদল ভিখারী দল বেধে ভিক্ষা করতে আসে।

হিন্দুদের ভিক্ষুকশ্রেণীর মধ্যে বেশীর ভাগ হলো অবাঙালী। বেশীর ভাগ এসেছে বিহার থেকে। একদা এরা

কর্মসূত্রে এদেশে এসেছিল স্বামীপুত্র সহ। পরবর্তীকালে অলিখিত নিয়মসূত্রে মেনে বেশির ভাগই পতির সঙ্গে এখন আর থাকে না। পতিরাও অনেকে আবার এদের ছেড়ে অন্য কোথাও ঘর বেঁধে রয়ে গেছে। এদের সঙ্গে নেই এদের পরিবারের আপনজনেরা। বরং ভিক্ষুকশ্রেণীরা সবাই একজায়গায় আস্তানা তৈরী করে একসঙ্গে থাকে। পুরুষ ভিখারীর তুলনায় মহিলা ভিখারীরাই বেশী শ্রেণীবদ্ধ ভাবে থাকে। পুরুষেরা কেউ এক সঙ্গে থাকে না। তবে প্রতি বুধবার নির্দিষ্ট সময়ে একসঙ্গে সবাই মিলে ভিক্ষা করতে আসে।

এদের মধ্যে জাতিভেদপ্রথা আছে বলে মনে হয় না। কেন না অনেকেই একসাথে ফুটপাতে রান্নাবান্না করে খায় একসাথে শোয়। সপ্তাহের প্রতিদিনই এরা নিয়মিতভাবে ভিক্ষা করে থাকে। তবে প্রতিদিন Area বদল হয়।

প্রতিদিন এরা ৪০-৫০ টাকা অবধি আয় করে। দৈনিক খরচা বাবদ প্রায় ২০টাকা গড়ে খরচ করে থাকে। বাকীটা সঞ্চয়ের খাতায় জমা। জমানো টাকাটা নিজেরাই গুছিয়ে রাখে। ব্যাংকের পরিষেবা এরা গ্রহণ করার সুযোগ পায় না। কারণ ব্যাংক এদের পাত্তা দেয় না। দু-একজন আমায় বলেছিল, মাঝে মাঝে বিভিন্ন পরবে ওদের দেশ থেকে কেউ কেউ আসে এবং এদের কাছ থেকে টাকা পয়সাও নেন। নির্মমতা এদের গ্রাস করেনি এখনও। মানবিক চেতনা এদের রয়েছে। জানি না সরকারী স্তরে কেন এদের বাসযোগ্য কোন স্থান দেয়া হয় না। এদের সঙ্গে কথা বললে মানসিক যন্ত্রণা অনুভূত হয়।

এক অসহায় বৃদ্ধা

শমিতা গোস্বামী

আদ্যাপীঠ মন্দিরে বসে থাকা চার বয়স্কা বিধবা ভিখারীনীর মধ্যে রেবা ঠাকুমাও ছিলেন। প্রতিদিন দুপুরে ঐ চারজন ঠাকুমাকে একসঙ্গে আদ্যাপীঠের মন্দির চত্বরে নিজেদের দুঃখ নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করতে করতে দিন কাটাতে দেখা যায়।

রেবা ঠাকুমার বয়স এখন প্রায় ৬৬ বৎসর। প্রতিদিন সকালে রাজচন্দ্রপুর অঞ্চল থেকে তার মানসিক প্রতিবন্ধী ছেলে 'সুবল'- কে নিয়ে বাঁচার তাগিদে দক্ষিণেশ্বরে ভিক্ষা করতে আসেন রেবা।

দক্ষিনেশ্বর মন্দির গেটের সামনে সকাল থেকে রেবা যখন ভিক্ষা বৃত্তি পালন করেন, তার মানসিক ভারসাম্যহীন ছেলে সুবল তখন দক্ষিনেশ্বর মন্দির সংলগ্ন 'ফুল-মালা-ডালা'-র দোকানে ফাই ফরমাস খেটে তার দৈনন্দিন অন্নের সংস্থান করেন। রেবা কিন্তু দুপুর হলেই সুবলকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে আদ্যপীঠ মন্দিরে উপস্থিত হন দুপুরের ভোজন সারতে। এই একটি মন্দিরেই নাকি কাউকে খালি পেটে ফিরতে হয় না। প্রত্যেকের খাওয়ার সংস্থান 'মা' তার ভক্তদের মাধ্যমে করে থাকেন। অভুক্ত- হা ভাতে- হা ঘরে মানুষেরা মায়ের অন্নের খোজে প্রতিদিন দুপুরে আদ্যাপীঠ মন্দির চত্বরে উপস্থিত হন।

ফিরে আসি রেবা ঠাকুমার কথায়। রেবার স্বামী তাঁর দুই ছেলেকে স্ত্রীর দায়িত্ব রেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলে অসহায় রেবা চরম দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করতে করতে কবে যে বৃদ্ধা হয়ে হয়ে গেছেন জানতে পারেন নি। রেবার তৈরী করা টালির ছাউনি দেওয়া দু-কামরার ঘরে আজ রেবা এক ঘরে। সুবলের দাদা দেবল মায়ের তৈরী করা ঘরে নিজের স্ত্রী

ও ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে তার সংসার জীবন পালন করছেন। দেবল তার বৃদ্ধা মা মানসিক প্রতিবন্ধী ভাই সুবলের কোনরকম দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করাতে রেবা ও সুবল আজ ভিখারি। ভিক্ষা একটি পেশা, ভিখারী একটি শ্রেনী। লড়াই শুধু প্রতিদিনের জন্য বাঁচা।

ভিখারী

রাধাশ্রী পাঠক ব্যানার্জী

প্রায়ই একটা কথা একটা শব্দ একটা অদ্ভুদ টোনে শুনতে পাই ''মা দুটি ভিক্ষা দেবেন?'' কোথায় যেন ট্রেনিং নিয়ে আসে ওরা। প্রায় সবারই একই সুর। গাড়ীর জানলার সামনে দাড়িয়ে যে ছেলেটি যে সুরে ভিক্ষা করছে। সেই একই সুর ঐ শিয়ালদহ স্টেশনেও। এরকমই একটি ছেলেকে ধরলাম। বললাম কোথায় থাকিস? নাম কি? কি সুন্দর বলল ''ঐ যে বড় বড় মোটা মোটা পাইপ গুলো রাস্তায় ফেলা ওরই একটার ভিতরে শুয়ে থাকি। একটার ফাঁকে ভিক্ষার পয়সাও রাখি। না হলে যে চুরি হয়। খাবার খেতে গেলে তাই করি।'' বললাম তোর বন্ধুরা? 'সবার জন্য একটা পাইপ'। বলল ছোটো বেলা থেকেই মা বাবা কে জানে না। হয়তো কোন গর্বিত পিতামাতার সুকর্তব্যের শিকার হয়েছে ঐ ছেলেটি। নামটাই তার ভিখারী। বলল, কি করব এর চেয়ে ভালো নাম আর পেলাম না। আমি বললাম এই ভাবে চেয়ে চেয়ে খাস তোর কাজ করতে ইচ্ছা করে না? কে দেবে কাজ? তাই তো, কে দেবে কাজ এই অনামী, নাগরিকগুলোকে যারা বড়োই হয় লাথি ঝাঁটা খেয়ে তাদের আবার কাজ দেওয়া। আবার খাওয়ানো। এটা কি মানুষের অধিকার লঙ্ঘন করা নয়? সরকার থেকে তাদের কর্মসংস্থানের, খাদ্যের, বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া কি উচিৎ নয়? ভালো সরকারী চেয়ার তারা চায় না। তাদের মানুষের অধিকার বলে, ঐ সমস্ত, ছেলে, মেয়ে, বউ, মহিলা, পুরুষ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ভিখারীদের খুঁজে বার করে বিভিন্ন জেলায় তাদের জন্য সরকারী হোমের ব্যবস্থা করে, হাতের কাজ থেকে শুরু করে, লেখাপড়া, শিখিয়ে তাদের অ-মানুষ থেকে একটু উন্নত ভাবে গড়ে তোলা উচিৎ যাতে নিজেদের খাদ্যের ব্যবস্থাটুকু তারা নিজেরা অন্তত করতে পারে। ভিক্ষা চাওয়া আর বেশীর ভাগেরই কাছে সেই ভিক্ষা পাওয়ার বদলে তাড়া খাওয়ার যে অমানবিক যন্ত্রণা পেতে তারা অভ্যস্ত হয় সেখান থেকে মুক্তি দিতে আমাদের। জনস্বার্থ কর্মীদের, সরকারকে এগিয়ে আসতেই হবে। আমাদের স্বমর্যদায় বাঁচার নূন্যতম অধিকার টুকু যাতে হারিয়ে না যায় তাই আমাদেরই সক্রিয় হয়ে খুঁজতে হবে সেই সব ভিখারীদের যারা ভিক্ষা দাও সুর শিখে লাথি খায়। শিখতে হলে ভালো কিছু শিখুক তা সে নর্দমা পরিস্কারই হোক আর বাগানের মালিই হোক। শুনতে তো হবে না ''যা ভাগ ভিক্ষা হবে না।''

বৃদ্ধ

কালীশংকর ফাউন্ডেশন

হলদিরামের ব্রীজের তলায় ছোটো একটি ছেঁড়া নোংরা কাপড়ের পুটলি মাথায় দিয়ে আকাশের পরিবর্তে ব্রীজের তলার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে শুয়ে আছে মনিরুল। পেটটা মিশে গেছে পিঠে। শিল্পায়নের দয়ায় গৃহহীনের ব্রীজরূপী ছাদ মিশেছে। আর রাস্তারূপী নিশ্চিন্ত বিছানা যেন দীর্ঘকাল ধরে হঠাৎ ওর স্থায়ী বাসস্থান। গেলাম তার কাছে।

জানালাম ওর আসল নাম মহিম। ছেলে মেয়ে কেউ নেই। কবে যেন মনে পড়ে না খিদের জ্বালায় চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল সে, তারপর ঝট্ করে নামটা বদলে মনিরুল হয়ে গেল। মানুষের খাদ্যের অধিকারটুকু বজায় রাখতে গিয়ে না জানি কত টুকটাক খারাপ ভালো কাজ করতে করতে কখন সে বৃদ্ধ হয়ে অক্ষম হয়েছে সে জানে না। এখন খাদ্য পাবার সেই নূন্যতম অধিকারটুকু রক্ষা করার ক্ষমতাও তার নেই। তাই সারাদিন অন্যের দয়ার আশায় পথ চেয়ে থাকে। যদি কেউ এক আধটা ঠোঙায় কিছু খাদ্য ছুঁড়ে দেয় তার দিকে। কিন্তু তার তো জানা নেই যে সরকারের একটা সুদারুন কর্তব্য বর্তমান। তার মতো অসহায়, জ্ঞানহীন, দরিদ্র, বৃদ্ধ(বৃদ্ধাদেরও) নূন্যতম খাদ্য সংস্থানের জন্য একটা ব্যবস্থা রয়েছে। কে বলে দেবে। একা মহিম নয় এরকম অজস্র মহিম ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যারা নিজের পেটের ভাত ও সারাদিনে পূরণ করতে পারে না। তাদের জন্য কিছু না কিছু ব্যবস্থা আছে যা মানাই হয় না। অসুস্থ হলে তো কথাই নেই। শুয়ে থাকে ভীষ্মের শর শয্যার মতো মৃত্যুর দিনের অপেক্ষায়। বিনা চিকিৎসায় মরতে যেন তারা অভ্যস্ত। আমরা জনস্বার্থকর্মীরা, সরকারি কর্মীরা কেন জায়গায় জায়গায় ঘুরে খুঁজে বের করি না তাদের? তাদের চিকিৎসার জন্য সরকারী হাসপাতালে নিখরচায় ব্যবস্থা থাকা কি উচিৎ না? এমন একটা পরিমাণের মাসোহারা সরকার থেকে দেওয়া উচিৎ যাতে আধপেট খেয়ে অন্ততঃ তাদের দিন কাটতে পারে। মানুষ হিসাবে জন্মগত যে অধিকার টুকুও তারা পায় না আমাদেরই গাফিলতিতে সেটা কি মানবাধিকার লঙ্ঘন করার অপরাধ নয়? তাই আমাদের প্রত্যেকের সচেতন হওয়া দরকার এই সব বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের সম্পর্কে। রোদ- বৃষ্টি। শীত থেকে বাঁচাতে সরকার থেকে নিখরচায় একটু ছোট্ট বাসস্থান দরকার যাতে অন্ততঃ এটুকু বোঝা যায় যে ঐ মহিমারও মানুষ , রাস্তার কুকুর বিড়াল নয়।

একথা উল্লেখ না করলেই নয় যে, সকল বৃদ্ধ বৃদ্ধারা আর্থিক সংস্থান থাকুক না থাকুক সন্তানের অবহেলার শিকার।

লাখপতি ভিখারিনী

বর্তমান, কলকাতা, ২৫শে আগষ্ট, ২০১২ বৃহস্পতিবার

বি. এন.এ বারাসাত ঃ এক ভিখারিনীর ঝুলি থেকে উদ্ধার হল ১ লক্ষ ৯ হাজার ৪১০ টাকা। বুধবার বিকেলে এই ঘটনা ঘটেছে বারাকপুর বি.এন বসু হাসপাতালে। দীর্ঘদিন ধরে টিটাগড় স্টেশনে থাকতেন মীনাদেবী নামে ঐ ভিখারিণী। কেউ খাবার দিলে তিনি তা খেতেন। রোদ, ঝড়, বৃষ্টি উপেক্ষা করেই স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে তিনি রাত কাটাতেন। গত ১৫ আগষ্ট স্টেশনে ফুটওভার ব্রীজ থেকে পড়ে তিনি আহত হন। স্থানীয় একটি ক্লাবের যুবকরা তাঁকে উদ্ধার করে বি.এন. বসু হাসপাতালে ভর্তি করেন। কিন্তু অবস্থার অবনতি হওয়ায় বুধবার তাঁকে কলকাতার আর. জি. কর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। বি এন বসু হাসপাতালে তাঁকে অ্যাম্বুলেন্সে তোলার সময় হাসপাতাল কর্মীরা তাঁর প্লাস্টিকের ঝুলি পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখেন। টাকা বের হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে তারা থানায় খবর দেন। পুলিশ গিয়ে ওই টাকা নিজেদের হেপাজতে নেয়। স্থানীয় লোকজন জানিয়েছে। ওই মহিলা সারাদিনে সে খুচরা পয়সা ভিক্ষা পেতেন তা সন্ধ্যে বেলা আশপাশের দোকানে দিয়ে নোট নিতেন। ওই টাকা তাঁরই পুলিশ জানিয়েছে টাকাগুলি ওই মহিলার। তিনি সুস্থ হয়ে ফিরলে তাঁর হাতে ওই টাকা তুলে দেওয়া হবে।

ভিখারিনী ও পরের প্রজন্ম

শমিতা গোস্বামী

কলকাতার ভূতনাথ অঞ্চলের এক ভিখারিনী, ধরা যাক তার নাম 'আশা'। সে ভূতনাথ মন্দির সংলগ্ন এলাকায় ছোট্ট বয়স থেকে ভিক্ষা করতো। তার ১৫ বছর বয়সে ঐ এলাকারই ফুলের দোকানের কর্মী, ধরা যাক তার নাম 'সুরেশ' আশার জীবনে ভালোবাসা নিয়ে আসে। প্রথমে পরিচয় এর পর ঘনিষ্ঠতা বাড়ে এবং ১৬ বছরের আশা 'মা' হয়। আশার ৪ মাসের ছেলে বাবা বলে ডাকার আগেই সুরেশ ঐ অঞ্চল ছেড়ে চলে যায়। ১৬ বছরের আশা তার ৪ মাসের পুত্র সন্তানকে নিয়ে নিমতলা শ্মশানে ভূতনাথ মন্দিরের সামনে বসে ভিক্ষা করে এবং আশা করে ভবিষ্যৎ-এ ওর ছেলে ১০ জনের এক জন হবে। কিন্তু ৬ মাসের ছেলে এখন আশার প্রত্যাহিক উপার্জনে সমান দাবীদার। কারণ আশা বুঝেছে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ভিক্ষা চাইলে বাবু-মায়েদের আবেগে লাগে এবং বেশী ভিক্ষা পাওয়া যায়।

আশার ছেলে, ধরা যাক নাম সোনু। ৩ বছরের সোনু এখন পুরদস্তুর ভিখারি। সে এখন আর মায়ের কোল ধরে ভিক্ষা করে না। স্বরোজগেরে সোনু এখন অনেক বেশী আত্মবিশ্বাসী।

ভিক্ষা মেলেনি বলে রান্না হয়নি, মা-কে কুপিয়ে খুন বাগদায়

(নিউজপেপার থেকে)

বনগাঁ

মা ভিক্ষে করে সংসার চালাতেন কিন্তু শুক্রবার পর্যাপ্ত ভিক্ষে মেলেনি। তাই বন্ধ ছিল রাতের রান্না। খিদে সহ্য করতে না পেরে মায়ের সঙ্গে প্রথমে বচসা, তার পরে তাঁর হাত-পা-ধড় কাটারি দিয়ে আলাদা করে কেটে মানসিক অবসাদগ্রস্ত ছেলে মৃতদেহটিকে পুঁতে দিয়েছিল রান্নাঘরের মাটিতে নীচে। সোমবার দুপুরে স্থানীয় গ্রামবাসীদের সাহায্যে বৃদ্ধার দেহটি উদ্ধারের পরে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের এমনই ধারণা।

ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বাগদার দেয়ালদহ গ্রামে। মৃতার নাম রেণুবালা বিশ্বাস (৮০)। পুলিশ তাঁর ছেলে সুনীলকে গ্রেফতার করেছে। বাগদার ওসি বিশ্বজিৎ পাত্রের দাবি, ''দীর্ঘদিন ধরেই মানসিক অবসাদে ভুগছিল সুনীল। জেরায় সে মাকে খুনের কথা স্বীকার করেছে।''

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ৪০ বছর বয়সী সুনীল কোনও কাজ করত না। তাঁর মা গ্রামে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করতেন। খাওয়া নিয়ে মা-ছেলের মধ্যে প্রায়ই অশান্তি হত। সুনীল বেশ একবার তাঁর মাকে মারধরও করে বলে অভিযোগ। সন্তোষ দাস নামে এক এক প্রতিবেশীর বাড়িতে রেণুবালাদেবী খাবেন বলে তাঁদের জানিয়েছিলেন। কিন্তু সে দিন তিনি খেতে যাননি। শনিবার সকালে সুনীলকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে জানায়, তাঁর মা বনগাঁ গিয়েছেন। তিনি বলেন ''এই কথায় আমাদের সন্দেহ নয়। কারণ রেণুবালাদেবীকে কখনও বাইরে থাকতে দেখিনি। রবিবার সকালে ওঁদের বাড়ির উঠোনে রেণুবালাদেবীর চটি দেখে সন্দেহ আরও গাঢ় হয়। রবিবার রাতে ওঁদের বাড়ি থেকে পঁচা গন্ধ পাই। সোমবার সকালে কয়েকজনকে নিয়ে ওঁদের বাড়িতে ঢুকতে গেলে সুনীল লাঠি নিয়ে বাধা দেয়। জোর করে ঢুকি। সুনীলকে চাপ দিতেই সে মাকে খুন করে পুঁতে ফেলার কথা জানায়।'' তাঁর দাবি, সুনীল তাঁদের জানিয়েছে, শুক্রবার রাতে মা-ই তাঁকে মেরে ফেলতে বলেছিল। তাই সে কাটারি দিয়ে মাকে কুপিয়ে খুন করে মাটির তলায় পুঁতে দেয়।

এ দিন গ্রামবাসীরাই পুলিশে খবর দেন। দুপুর ১২টা নাগাদ পুলিশ এসে সুনীলদের রান্নাঘরের মাটি খুঁড়ে রেণুবালাদেবীর মৃতদেহটি উদ্ধার করে। উদ্ধার করা হয় কাটারিটিও। এই নৃশংস খুনের ঘটনায় গোটা গ্রাম থমথমে। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, রেণুবালাদেবীর হাত, পা, ধড় আলাদা আলাদা ভাবে ভ্যানরিকশার উপরে রাখা হয়েছে। পুলিশ দেহটি ময়না-তদন্তের জন্য বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। অসীমা বিশ্বাস নামে স্থানীয় গৃহবধু বলেন ''রেণুবালাদেবীর কাছে শুনেছি অসমে থাকাকালীন সুনীলবাবু প্রেমে পড়েছিলেন। কিন্তু সেই প্রেম টেকেনি। তার পর থেকেই তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েন।''

পুলিশ জানায়, ধৃতকে মঙ্গলবার বনগাঁ আদালতে তোলা হবে।

কে ভিখারি, কে শিকারি

(নিউজপেপার থেকে)

গৌতম গুপ্ত

অফিসে আসা যাওয়ার পথে রোজই তো দেখি। দেখতে দেখতে সয়ে গেছে। ওই যে কিশোর ছেলেটি। কলকাতার অন্যতম প্রাচীন চিনে রেস্তোরাঁ, 'চাং ওয়া'-র সামনে চাঁদনি চক মেট্রো স্টেশনের যে বেরনোর মুখ, তার সামনে ও ভিক্ষে করে। শীত, গ্রীষ্ম বারো মাস। এক দিনও কামাই করলে ওর চলবেই কী করে? ছেলেটি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না আক্ষরিক অর্থেই সে চতুষ্পদ।

এর আগে দেখতাম এক টাক-মাথা বৃদ্ধকে। তার ভিক্ষে চাইবার বাক্যটি সকলেরই কানে বাজত— 'বাবু, বড় খিদে পেয়েছে।' এই কথাটির জোরেই কি না জানি না, মাঝে মাঝে সিকি-আধুলি জুটেও যেত তার। সেই মানুষটিকে অনেক দিন আর দেখি না। বৃদ্ধের খিদে মিটেছে কিনা তাও জানি না।

সিঁড়ির ঠিক শেষে অনেক দিনই জড়োসড়ো দাঁড়িয়ে থাকেন এক বৃদ্ধাও। চোখে ঘোলাটে চশমা। প্রায়ই বিরক্ত লাগে হুড়োহুড়ি করে বেরিয়ে আসবার মুখে মূর্তিমতী বাধাটিকে দেখে। আর, কাউকে কোনও বাধা না দিয়ে চার হাত-পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে ঘাড়টা উঁচু করে মেট্রো যাত্রীদের কাছে ভিক্ষে চায় ছেলেটা।

সে দিন দেখি তার পাশে টাই-পরা এক যুবক। হাতে এক গোছা রঙিন কাগজ। এ আবার কে? এক লহমা থাকতেই বোঝা গেল। এক নামী ব্যাঙ্কের হয়ে ঋণ গছাতে এসেছে।

আমি মেট্রো যাত্রী। আমার সামনে চতুষ্পদ ভিখিরির প্রসারিত ভিক্ষাপাত্র। পাশেই অপার বাড়ানো হাতটিতে ঋনের হাতছানি। বাড়ি কেনার, গাড়ি কেনার, কিংবা, বেড়াতে যাওযার। কোন হাতটিকে ছোঁব আমি?

কোন হাত?

যমুনায় ঝাঁপ দিয়ে অর্থ রোজগার যাদের জীবন
দিল্লি

যমুনা কাউকে ফেরায় না। এটা একেবারেই সত্যি। আট বছরের ছোটো ছেলেটাও বোঝে। এই অল্প বয়সেই জীবনে যমুনার তাৎপর্য বুঝে গেছে সে। আট থেকে আশি সবার কাছে অন্নদাত্রী যমুনা। কেয়ার অব আকাশের বাসিন্দা এদের বেশির ভাগই। পেশা টাকা পয়সা সংগ্রহ। এই সংগ্রহ অনেকেরই কাছেই দেবী। ভক্তির বিষয়। কথায় আছে বিগলিত করুণা/জাহ্নবী যমুনা। তাই অনেকেই ভক্তি ভরে টাকা পয়সা যমুনায় ফেলেন অনেকেই। প্রতিদিন। আর সেই অর্থ নিয়েই বাঁচার অর্থ খুঁজে পায় 'কয়েন ডাইভারেরা'। এদের নিয়ে ২২ মিনিটের তথ্য চিত্র তৈরি করেছেন আকাশ অরুন। এই ছবির নাম ইন-সার্চ অফ ডেসটিনি (কয়েন ডাইভারস) ৪০০ থেকে ৫০০ জন বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা এই পেশায় আছে। রাজধানী দিল্লিতে থাকেন এই অদ্ভুত পেশার মানুষেরা। যমুনার পাড়েই জীবনের ঠিকানা এদের। শুরু ও শেষ যমুনায়। তথ্যচিত্রের শুরু এইরকম এক কিশোরকে দিয়ে। ডি-এস এল ক্যামেরায় বন্দি এই কিশোর। জুমিং। দেখা যায় ডাম্বেলের মতো এক যন্ত্র দিয়ে যমুনা। আর কয়েন ডাইভারদের ৬০ শতাংশের বাস যমুনা পাড়ের ৪-৬ কিলোমিটার মধ্যে। তাঁদের দৈনিক আয় গড়ে ১০০টাকা। তাই দিয়ে বাস্তব ও স্বপ্ন নিয়ে বাস। এক ৮৮ বছরের বৃদ্ধ ছোটোবেলা থেকে এই পেশায়। তাঁর কথায় যমুনা আমাদের জীবনে অর্থ দিয়েছে। এই নদীর খোলা আকাশ আমাদের মতো অনেকেরই স্থায়ী ঠিকানা। বাড়ি ঘর সবই আমাদের কাছে যমুনা। ইনি এই তথ্যচিত্রে অন্যতম প্রধান চরিত্র। নাম সাংমা। আসল বাড়ি কোথায়? আজ তাঁর আর মনে নেই। তিনি জানান একরকম ভাগ্যের ফেরেই আজ এই পেশায়। ছিলেন সৈনিক। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কাজ করতেন। সেনাবাহিনীতে কিছু বদ লোকের সঙ্গে ঝামেলা লাগে তাঁর। চলে ধ্বস্তাধ্বস্তি। তারা ছুরি মারতে যায়। আত্মরক্ষা করতে গিয়ে ওই দুবৃত্তদের (তাঁর কথায়) ছুরি চালিয়ে মেরে ফেলে তিনি। তারপর সেনাবাহিনীর চাকরি যায়। হয় জেলও। জেল থেকে ছাড়া পান। হাতে কোনও কাজ ছিলনা তখন। সমাজের মুলস্রোতও তাঁকে করেছিল ব্রাত্য। চিরকালের মতোই। হতাশ হয়ে যমুনায়। তারপর এই পেশাকেই জীবনে বাঁচার রসদ হিসাবে বেছে নেন তিনি। ৪০ বছর হয়ে গেল কয়েন ডাইভারিতে। এখনও মনে হয় বাধ্য হয়েই এসেছিলেন তিনি।

আর এক চরিত্র অগাষ্টিন ঘাগরে। বাড়ি মহারাষ্ট্রে। আজ এখানে । ড্রাগ নেওয়ায় বাড়ি থেকে বিতারিত। অসুস্থ অবস্থায় যমুনায় এসেছিলেন। সাংমার কাছে এই পেশায় হাতেখড়ি তাঁর। আজ সুস্থ জীবনে ফিরে গেছেন অগাষ্টিন। এই মারাঠি শুরু থেকেই ক্যামেরা সচেতন। ক্যামেরার সামনে প্রথমে একেবারেই মুখ খুলতে চাননি। দুই এনজিও কর্মী পরিচালকের বন্ধু। তাঁদের সহায়তায় অগাস্টিন সাবলীল হন। অকপটে জানান জীবনের কাহিনী। এই তথ্যচিত্র দেখান হয় এইসব কয়েন ডাইভারদের বাসস্থান। তা অত্যন্ত অপরিস্কার। অপরিচ্ছন্ন। অস্বাস্থ্যকর। তবু যমুনাকে কেন্দ্র করে বছরের পর বছর এদের বাঁচা। ভাব ভালবাসা। প্রেম ও অ-প্রেম। একে অবহেলিত এই কয়েন ডাইভার সম্প্রদায়। সমাজ এদের জন্য ভাবে না। নেই কোনও সহানুভূতি। গণমাধ্যমের কাছেও এরা ব্রাত্য। ব্রেকিং নিউজ নন এরা টিভি চ্যানেলগুলোর কাছেও। এই বিষয় নির্বাচন নিয়ে অরুনের বক্তব্য, সমাজের প্রান্তিক এই সব মানুষ একটু ভালবাসা, সমাজের সহযোগিতা পাওয়ার যোগ্য। এদের মধ্যে এখনও অনেক ড্রাগ খান, ভবঘুরে। এই জীবন নিয়ে অবশ্য বেশির ভাগেরই সাংমার মতো নালিশ নেই। তারা তৃপ্ত। পেট ভরুক না ভরুক, যমুনায় ঝাঁপ দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করেন তাঁরা। এ কাজ শুধু পেশাই নয়, নেশাও এদের বেশিরভাগের কাছেই। পরিচালকের অভিযোগ, রাজধানী দিল্লিতে এরা অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়তেই পারতেন যখন-তখন। তা না করে সুস্থ জীবিকা বেছে নিয়েছেন এইসব কয়েন ডাইভারেরা। তার বদলে উদ্বাস্তুর অসম্মান পান তাঁরা। পদে পদে হতে হয় হেনস্থার শিকার। এই অবস্থার পরিবর্তন চান বলেই এই তথ্যচিত্র বানিয়েছেন অরুন। তাঁর পরবর্তী লক্ষ্য তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রককে এই তথ্যচিত্র দেখানো। আর তথ্যচিত্রটি ইন্ডিয়ান প্যানারোমা ফিল্মোৎসবে দেখান হলে স্বপ্ন সার্থক হবে অরুনের।

বিবাহোৎসবে ভিখারি নিমন্ত্রণ

৫৪ বছর বয়সী সাহা মশাই রেলওয়ে স্টেশন, রাস্তা, বাজার এবং মন্দির সংলগ্ন অঞ্চল থেকে তার ২২ বছরের ছেলে সঞ্জয় ও মাম্পীর বিবাহে ১৮৭ জন ভিখারিকে নিমন্ত্রণ করেন যা অনুষ্ঠিত হয় পশ্চিমবঙ্গের পূর্বপ্রান্তের রাজধানী সোদপুর শহরে।

বিবাহে ভিখারিদের নিমন্ত্রণ প্রসঙ্গে মলয় সাহা বলেন এটা তাঁদের পারিবারিক পরম্পরা। যা তাঁদের পরিবারের অবিবাহিত পুত্র-কন্যার ভবিষ্যৎ জীবনকে ঐশ্বরিক আশীর্বাদ এনে দেবে। ব্যবসায়ী আরো জানান যে, এই নিমন্ত্রনে ঐ ভিখারিরা প্রথমে হতবাক হয়ে যান এবং ভয় পান যে পুলিশ তাদের ধরবে।

ভিখারিরা প্রথমে অবিশ্বাস করলেও প্রত্যকেই বিবাহ অনুষ্ঠানে আসেন এবং ভাত-দু-ধরণের ভাজা মাছ-মুসুর ডাল ও ঐতিহ্যপূর্ণ মিষ্টির ভোজ উপভোগ করেন। সাহা মশাই জানান যে, তাঁর বাবা তাঁর বিয়েতে ১৫০ জন ভিখারিকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ান এবং ভিখারিরা তাদের আশীর্বাদ করেন। সাহা মশাইদের সংসার জীবন স্বচ্ছল ও সুখের হয়েছে।

নববধূ মাম্পি ভিখারিদের খাবার পরিবেশন করার সময় বলেন, ''আমি বিশ্বাস করি এই শুভদিনে ভিখারিদের খাওয়ালে ভগবান আমাদের আশীর্বাদ করবেন।''।

সাহা মশাই আশা করেন যে, তার ২২ বছরের ব্যবসায়ী পুত্র এই ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখবেন। খাওয়ানোর পরে ঐ ভিখারীদের মধ্যে কাপড় ও ফল বিতরণ করা হয়।

''আজকের দিনের জন্য আমরা ভিখারি নই। আমরা ভালো কাপড় পড়েছি, ভালো নৈশভোজ সেরেছি এবং নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করে আমাদের আস্তানায় ফিরে যাব।''— বলে গুড্ডু, সে সোদপুর রেলস্টেশনে ভিক্ষা করে। গুড্ডু আরও জানায়, সাহা পরিবার আমাদের লাল গোলাপ ও ঠান্ডা পানীয় দিয়ে স্বাগত জানায়। এটা ছিল আমাদের কাছে একটা স্বপ্ন, যদিও প্রথমে আমাদের অনেকেই নিমন্ত্রণকে মজা ভেবে উড়িয়ে দিয়েছিল।

আগেকার দিনে বাড়ি বাড়িতে যে ভিক্ষুক আসতেন তাঁদের ভিক্ষা দেওয়া গৃহস্থের কর্ত্তব্য বলে বিবেচিত হত। কিন্তু উন্নয়নের সাথে সাথে এই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। সেই সময় ভিক্ষাকালে ঐ ভিক্ষুকের কুশল খবরও নেওয়া হত এবং গৃহস্থের সঙ্গে একটি সুন্দর সম্পর্ক ছিল।

'ভিখারি সুশীলা'

শমিতা গোস্বামী

ভিক্ষুকের নাম সুশীলা খাঁ। বয়স ৭৫ বছরে। সুশীলা দেবী একজন হিন্দু মহিলা। তিনি কলকাতার টালিগঞ্জে পুলের ধারে থাকেন ছোট্ট একটি মাটির তৈরী বাড়িতে। তিনি একা থাকেন। যদিও তাঁর প্রকৃত বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জয়নগরের কোমলপুর গ্রামে। স্বামী মারা যাওয়ার পর রুজি রোজগারের এবং নিজের তিন মেয়েকে মানুষ করার জন্য দীর্ঘদিন আগে কলকাতাতে চলে আসেন এবং বর্তমানে তিনি কলকাতারই বাসিন্দা। বর্তমানে ইনি মুদিয়ালি লেক টেম্পল রোডের ধারে শিব মন্দিরের ধারে বসে ভিক্ষা করেন।

সুশীলা দেবী একদমই পড়াশুনা জানেন না। তাই খুব অল্পবয়সেই তাঁর বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের পর তাঁর তিন মেয়ে জন্মায় এবং তারপরই তার স্বামী মারা যান। বর্তমানে যদিও ঐ তিন মেয়ের কাছে তিনি থাকেন না। বাধক্যজনিত

কারণে তার শরীরের অবস্থা খুব একটা ভাল নয়। প্রায়ই তার শরীরের বাঁ দিকটা অবশ হয়ে যায়। এই জন্য তিনি প্রায়ই মুদিয়ালীর সামনে ডাক্তারি ক্যাম্প বসে সেখানে দেখাতে যান। কিন্তু তার অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। তাই এই অসুস্থতার জন্য তিনি খুবই কষ্ট পান। এখনও তিনি অন্যের কাছে থেকে বা অন্য কোথা থেকে কোন লোন গ্রহণ করেননি তাঁর অবস্থার উন্নতির জন্য বা বড় ডাক্তার দেখানোর জন্য। সারাদিনে ভিক্ষে করে যেটুকু ২৫-৩০ টাকা হয়, তাতেই দুবেলা কোনক্রমে খাবার জোটে। বেশি টাকা হলে সেটা বাড়িতেই অন্য কোনদিনের জন্য রাখেন যদি কোনদিন ভিক্ষা করতে না পারেন। সুশীলা দেবীর নিজের ভারতীয় নাগরিক হিসাবে স্বীকৃত হওয়ার জন্য প্রমাণ স্বরূপ ভোটের কার্ড এবং রেশন কার্ড দুটোই আছে।

ভিক্ষা করার কারণ ঃ

সুশীলা দেবী যখন কলকাতাতে আসেন তখন প্রথম দিকে তিনি মুদিয়ালীর টেলিফোন একস্‌চেঞ্জে এবং তার কাছাকাছি জায়গায় তিনি ফোনের তার এবং ফোনের কিছু বিক্রিযোগ্য জিনিসপত্র কুড়োতেন। এছাড়াও কিছু ভারী কাজও করতেন। কিন্তু যখন থেকে তিনি তাঁর শারীরিক অসুস্থতার কারণে ভারী কাজ করত পারলেন না তখন থেকে তিনি ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করেন। তার কোন ছেলে নেই, তিন মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দেবার পর তারাও কোন খোঁজ খবর রাখে না। সুশীলা দেবী তার জয়নগরের বাড়িতে গেলেও সেখানে তাঁর যে আত্মীয়েরা আছেন তারা তাকে দু'-এক দিনের বেশি থাকতে দেন না, বলে তাকে বসিয়ে খাওয়াতে তারা অক্ষম। বর্তমানে সুশীলাদেবী মনে করেন তিনি এইখানেই ভালো আছেন এবং এভাবেই জীবন কাটাতে চান। তাই তিনি কোনও পুনঃর্বাসনও চান না। তাই তিনি বর্তমান অবস্থার মধ্যে দিয়েই তার বাকি জীবন কাটাতে চান।

ভিখারি ও নৈতিকতা

জনার্দন (ভিখারী)

দক্ষিনেশ্বর মন্দিরের ফুটপাতে গত প্রায় ২০ বৎসর যাবৎ ভিক্ষা করে চলেছেন। তিনি জানালেন, ভিখারিরা কোন সময়েই খুচরা পয়সা অথবা কয়েন জমায় না। ২ টাকা ও ৫ টাকার কয়েন জমানোর অভ্যাস শুধুমাত্র মধ্যবিত্ত বড়লোকদের।

২০১২ সালে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে খুচরা পয়সার আকালে ভিখারিদের তাই কোন মতেই দায়ী করা যায় না। ভিখারীরা প্রতিদিনের খুচরা স্থানীয় বাজারে জমা দিয়ে বদলে টাকার নোট নেন। খুচরা পয়সার আকাল হলে সবথেকে অসুবিধায় পড়বেন ভিখারিরা। কারণ সাধারণ লোক খুচরা পয়সাতেই ভিক্ষাদান করেন।

আধুনিক ভিখারী

দীপঙ্কর মিত্র

বারাসাত-হাসনাবাদ লোকাল, যাতে ওঠে একটি দল, তাদের প্রত্যেকের হাতে থাকে মোবাইল। এই মোবাইলের সাহায্যেই এরা ঠিক করে নেয় কে কোন কম্পার্টমেন্টে উঠবে এবং যাতে সবারই কিছু না কিছু রোজগার হতে পারে। এরা

কারা ? এরা গান করে পয়সা নিয়ে থাকে। এরা সকলেই দৃষ্টিহীন। এরা নিজেদের ভিখারী বলে পরিচয় দেয় না। এরা বলে আমাদের গলায় সুর আছে। আমরা সেই সুর দিয়ে গান করে লোককে আনন্দ দিয়ে পয়সা নেই। ভিক্ষা করি না।

ডায়মন্ড হারবারে ১৫৫ টাকায় তিন নাবালিকাকে বিক্রি করলেন অসহায় মা

দৈনিক স্টেটসম্যান

শুক্রবার বিকেলে তিন নাবালিকাকে মাত্র ১৫৫ টাকায় বিক্রি করার দায়ে মাকে আটক করল ডায়মন্ডহারাবার থানার পুলিশ। এই তিন নাবালিকা মেয়ের বয়স দশ, আট ও চার বছর বলে জানা গেছে। খবর লেখা পর্যন্ত তিন কন্যাকে উদ্ধার করতে পুলিশ মাকে নিয়ে সেই বাড়িতে অভিযান চালাতে যায় সেখানে বিক্রি করা হয়েছে তিনটি মেয়েকে। ডায়মন্ড হারবারের মহকুমা শাসক কৌশিক ভট্টাচার্যের নির্দেশে পুলিশ এই অভিযান শুরু করে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেল, ডায়মন্ড হারবার থানা এলাকার নেওড়া অঞ্চলের মালঞ্চ গ্রামের পাইপলাইনের কাজের কর্মী উত্তম হালদার স্ত্রী পূর্ণিমা হালদারকে তিনকন্যা সহ মারধর করে বাড়ি থেকে বার করে দেয় তিনদিন আগে। অসহায় মা তিন কন্যাসন্তানকে নিয়ে ডায়মন্ডহারবার স্টেশনে রাত কাটান। এরপর স্টেশনে আলাপ হয় জনৈক প্রভাস নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে মা । পূর্ণিমা প্রভাসবাবুকে জানান মেয়ে তিনটিকে নিয়ে তিনি বড় অসহায় বোধ করছেন। প্রভাসবাবু বুদ্ধি দেন, যে দম্পতির সন্তান নেই, তাদের কাছে মেয়ে তিনটিকে বিক্রি করে দিলে ওরা খেয়ে পরে বাঁচবে। এরপরেই প্রভাসবাবুর সহায়তায় ডায়মন্ডহারবারের কপাটের হাটে ১০ বছরের বড় মেয়েকে ৬০টাকায়, ডায়মন্ডহারবার টোল ট্যাক্সের কাছে ৮ বছরের মেজো মেয়ে কে ১০০ টাকায় ও জয়নগরের একটি পরিবারে ৪ বছরের ছোট মেয়েকে ২৫ টাকায় বিক্রি করে দেন এদের মা পূর্ণিমাদেবী।

এই ঘটনা স্থানীয় মানুষ জানতে পরের মহকুমা শাসককে জানালে, তিনি ডায়মন্ডহারবার থানার আইসিকে পূর্ণিমাদেবীকে সঙ্গে করে মেয়েদের উদ্ধার করার নির্দেশ দেন। সন্তানদের বিক্রি করার পর অসহায় মা'র কান্নায় বিষয়টি সকলের নজরে আসে। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ খতিয়ে দেখছে, এর পিছনে বড় কোনও পাচারচক্র যুক্ত আছে কিনা।

অবশেষে শনিবার সন্ধ্যা থেকে বিকাল পর্যন্ত বিক্রি হওয়া তিন সন্তানকে উদ্ধার করল ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিস। প্রিয়া হালদারকে সুভাষগ্রাম ও রমা হালদার। সুপ্রিয়া হালদারকে ডায়মন্ডহারবার কপাটহাট ও টোলট্যাক্স সংলগ্ন এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার তিন শিশু ও নাবালিকাকে একটি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী হোমে রাখার ব্যবস্থা করেছে প্রশাসন। প্রসঙ্গত, শনিবার বিকালে স্টেশন চত্বরে রমাকে ২৫ টাকার বিনিময়ে বিক্রি করেছেন জন্মদাত্রী পূর্ণিমা হালদার। ১০০ ও ৩০ টাকা বিনিময়ে প্রিয়া ও সুপ্রিয়াকে বিক্রি করেন বৃহস্পতিবার। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়ে নেতড়া গ্রামের উত্তমের সহিত পূর্ণিমার বিয়ে হয় চোদ্দো বছর আগে। তাঁদের তিন কন্যা সন্তানও হয়। দিন পনোরো আগে তিন সন্তানসহ পূর্ণিমাকে মারধর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। তারা ডায়মন্ড হারবার স্টেশন চত্বরে ভিক্ষা করে দিন গুজরান করে। কয়েকদিন পরে প্রভাস মন্ডল নামে এক যুবকের সঙ্গে পরিচয় করায় তারই প্ররোচনায় তিন সন্তানকে বিক্রি করে দেয় বলে অভিযোগ। এদিন রাতে উত্তম হালদারকে বধূ নির্যাতনের অপরাধে গ্রেফতার করে ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিস। সোমবার তাকে আদালতে তোলা হবে।

নাতনির বিয়ের জন্য ভিক্ষা করে টাকা জমান বীণাদেবী

সুদীপ ভট্টাচার্য, শান্তিপুর

শার্লক হোমসের গল্পের শ্রীযুক্ত নেভিল সেন্ট ক্লেয়ার ভিক্ষা করে টাকা জমাতেন সম্পন্ন সংসারী হবেন বলে। শান্তিপুরের বাগচিবাগানের বীণা সাহা কিন্তু ভিক্ষা করে তাঁর ভান্ডার ভরাচ্ছিলেন একটি স্বপ্ন পূরণের জন্য— ধুমধাম করে বিয়ে দেবেন নাতনিকে। সব মিলিয়ে তাঁর সম্পত্তির হিসেব দাঁড়িয়েছে প্রায় লাখ খানেক টাকার।কিন্তু তাঁর স্বপ্ন বুঝি কিছুটা ধাক্কা খেল প্রতিবেশীদের কৌতুহলের তাড়নায়।

সোমবার বীণাদেবীর অনুপস্থিতিতেই তাঁর ঝুপড়ি ঘরে ঢুকতে বাধ্য হন বাগচিবাগানে তার প্রতিবেশীরা। কয়েক দিন ধরেই ঘর থেকে পচা গন্ধ বেরোচ্ছিল। তাঁরা ঢুকে দেখেন, একটা ভাম মরে পড়ে রয়েছে। তা থেকেই দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। তবে সেই সঙ্গে ঘরের মাটির মেঝে থেকে মেলে প্লাস্টিকে মোড়া হাজার হাজার খুচরো টাকা-পয়সা। সব মিলিয়ে তার মূল্য দাঁড়ায় পাঁচ হাজার একশো সত্তর টাকা। প্রায় সপ্তাহ খানেক পরে মঙ্গলবার বীণাদেবী ফিরে আসে তাঁর ডেরায়। সব ওলট পালট দেখে খেপে আগুন হয়ে যান বৃদ্ধা। মুখে কেবল একটাই কথা, ''মেলা টাকা ছিল। মেলা টাকা। সোনাও ছিল। নাতনির বিয়ে দিতে হবে না?'' তাঁর ঘর থেকে চার গাছা সোনার চুরি ও এক জোড়া সোনার দুলও পাওয়া গিয়েছিল সোমবার।

বীণাদেবী অবশ্য সব টাকা গহণাই ফেরত পাচ্ছেন। রানাঘাটের মহকুমা পুলিশ অফিসার অংশুমান সাহা বলেন ''ওই মহিলার বাড়ি থেকে যে টাকা-গহনা পাওয়া গিয়েছে তার সবটাই তিনি স্বাভাবিক ভাবেই ফেরত পাবেন। সেই জন্য তাকে থানায় আসতে বলা হয়েছে।

তবে পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বীণাদেবী ভিক্ষার টাকায় একটি ঘরও তুলেছেন। টিনের চাল, ইটের দেওয়াল। দরজায় লোহার গ্রিল। বছর ছ'য়েক ধরে একটু একটু করে ওই ঘরখানা যে তুলেছেন, তা জানতেন তাঁর প্রতিবেশীরা। বীণাদেবী নিজে অবশ্য সেই নতুন ঘরে থাকতেন না, তাঁর বাস ছিল ওই ঝুপড়িতেই। বীণাদেবীর পাশেই থাকতেন তাঁর বোন নিয়তিদেবী। তাঁর কথায়, ''দিদি যে খুব কষ্ট করে একটা ঘর তুলেছে, তা জানতাম। কিন্তু কোনও দিন সেখানে কাউকে ঢুকতে দেয়নি।'' সেই ঘরটাও তিনি যে রেখে দিয়েছেন নাতনির জন্যই। তাঁর প্রতিবেশী স্বপন দেবনাথ বলেন, ''ভেবেছিলাম বীণাদেবী তার স্বামীর জমানো অর্থ দিয়েই ঘরটা বানিয়েছে। তারপরে সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়ে ভিক্ষা করতে শুরু করেন। কিন্তু এখন দেখছি, ঘটনাটা অন্য রকম। তিনি ভিক্ষার টাকাতেই বেশ বড়লোক ছিলেন বলা যায়।'' ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার যতন সরকারের কথায়, '' বীণাদেবীর সম্পত্তির হিসেব ধরলে লাখ খানেক টাকা তো হবেই। ওই এলাকায় এক কাঠা জমিই তো এখন ত্রিশ হাজার টাকা করে। একজন ভিক্ষুকের এত সম্পত্তি হতে পারে, এটা ভাবনারই বাইরে ছিল।''

কিন্তু কী বলছেন তাঁর নাতনি প্রিয়াঙ্কা সরকার? মায়ের সঙ্গে সে থাকে ধুবুলিয়ার পাতলা গ্রামের মামাবাড়িতে। যষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী। সেই কিশোরীর বক্তব্য, ''ঠাকুমা নিজের জন্য কখনও হাত খুলে খরচ করেন না। কখনও ভালো কিছু খায় না। ভাল কিছু পরে না। কিন্তু তিল তিল করে জমিয়েছে এই টাকাটা। ওই ঘরটাও আমার জন্যই বানিয়েছে। এবার আমি ঠাকুমাকে বাধ্য করব নিজের জন্যও খরচ করতে।''

বীণাদেবীর কিন্তু আক্ষেপ যাচ্ছে না। বারবার বলছেন, ''এখন তো সবাই সব জেনে গেল। আর কি আমি ভিক্ষা পাব?''

সব রোগ রোগ নয়, আসলেতে ফাঁকি সে

অদ্ভুত জীবিকা ঃ সৌজন্যে- আনন্দবাজার পত্রিকা

অনেক বড় বড় মেলায় ওদের দেখা যায়। তবে, বীরভূম জেলায় কোনও এক বিখ্যাত মেলায় শ'য়ে শ'য়ে গলিত কুষ্ঠ রোগী দেখে দুদিন ভাল করে খেতে পর্যন্ত পারিনি। ওদের গলে পড়া মাংস কিংবা চামড়া ফেটে রক্ত গড়ানোর দৃশ্য আর যন্ত্রণায় চিৎকারের কথা মনে পড়লেই গা শিউরে ওঠে।

মানুষ তাদের পেতে রাখা থালায় চাল, ফলমূল, টাকা দিচ্ছে। বিদেশী টুরিস্টরাও ক্যামেরা বার করে পটাপট ছবি তুলছে আর ৫-১০ টাকার নোট ছুড়ে দিচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে, কোনও একটা সাইবার-কাফেতে পৌছনোর অপেক্ষা। তার পরেই বিশ্ব নেট দিয়ে ওই ছবি পাড়ি দেবে দুনিয়ার নানা প্রান্তে, বড় বড় চোখে 'ওরা' দেখবে, 'হাউ দ্য আদার হাফ ডাইজ!'

কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেলাম, যখন পরে শুনলাম, সবাই নয়, কিন্তু ওদের বেশির ভাগই নাকি নকল কুষ্ঠ রোগী সেজে অভিনয় করছে! কৌতুহলী হয়ে একটু খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম বিষয়টা। চার-পাঁচ জন বেকার ছেলে মিলে একটা দল তৈরি করে। যে কোনও বড় মেলার আগে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আশে পাশের গ্রাম থেকে লোক ভাড়া করে আনে।

তারপর নিখুঁত মেক-আপ ম্যানের মতো আলু থেঁতো, রুই ময়দা আর আলতার সাহায্যে তারা তাদের মেকআপ দিয়ে মেলায় বসিয়ে দেয়। ওরা ভোর থেকে এগারোটা বারোটা পর্যন্ত পরিষেবা দেয়। তারপর রাতের অন্ধকারে মেলার ভীড়ে মেলার দর্শক সেজে ঘুরে বেড়ায়। মেলা শেষে ওদের খাওয়া-পরার খরচটুকু বাদ দিয়ে যা টাকা ওঠে, তা ১ ৩ অনুপাতে ভাগাভাগি হয়।

সাত বছর নিখোঁজ কর্মীর অর্থ নমিনিকে দিতে নির্দেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা

স্বামী বা স্ত্রী যদি সাত বছর নিখোঁজ থাকেন, তাহলে তাঁকে মৃত ধরে নিয়ে তাঁর মনোনীত নমিনিকে প্রভিডেন্ট ফান্ড ও অবসরের পরে প্রাপ্য অন্যান্য টাকা দিয়ে দিতে হবে হলে রায় দিয়েছে হাইকোর্ট। শান্তিদেবী নামে এক অসহায় মহিলার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই রায় দিয়েছে বিচারপতি অমিতাভ লালা।

শান্তিদেবী সন্তানদের নিয়ে বর্তমান বস্তি থেকে উচ্ছেদ হয়ে রাস্তায় থাকেন। তাঁর স্বামী বেঙ্গলি সিংহ ছিলেন হুকুমচাঁদ জুট মিলের কর্মী। ১৯৯৫ সালে তিনি নিখোঁজ হন। শান্তিদেবী পুলিশকে সব জানান। পুলিশ সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেয়। কিন্তু বেঙ্গলির খোঁজ মেলেনি। তাঁর কাজ চলে যায়। অচল হয়ে যায় শান্তিদেবীর সংসার। তাঁকে বস্তি থেকে উচ্ছেদ করে দেওয়া হয়। ভিক্ষা করে সন্তানদের নিয়ে দিন কাটে ওই মহিলার। চটকলের কাছে বারবার আবেদন করলেও তারা জানিয়ে দেয় তাকে বেঙ্গলির টাকা দেওয়া যাবে না।

ভিখারীদের নেশা, যৌনতা ও অসুখ-বিসুখ

বেশিরভাগ পুরুষ ভিখারীরা 'গাঁজা-ভাঙ-আফিম, মদ, তামাক ও গুটকা' সেবন করেন এবং ভিখারীদের মধ্যে অনেকেই বর্তমানে 'ব্রাউন সুগার' -এর নেশা করে থাকেন। মহিলা ভিখারীদের মধ্যে অনেকেই 'দোক্তা ও গুটকার' নেশা করে থাকেন। কিছু কিছু অল্প বয়সি মহিলা ভিখারীরা ব্রাউন-সুগারের নেশা করে থাকেন। এছাড়া বাচ্চা ভিখারীরা 'ডেনড্রাইট'-এর নেশা করে।

অনেক পুরুষ ভিখারী অথবা রাস্তায় বসবাসকারী পুরুষ, রাস্তায় বসবাসকারী মহিলা ভিখারীদের সঙ্গে যৌনতায় আবদ্ধ হন। এর কারণে অনেক মানসিক প্রতিবন্ধী মহিলা পিতৃপরিচয়হীন বাচ্চার জন্ম দান করেন এবং ভবিষ্যতে এইসব বাচ্চারা সমাজের মূল স্রোতে মিলতে পারে না এবং অপরাধ জগতে প্রবেশ করেন।

ভিখারীদের মধ্যে চর্মরোগ- কুষ্ঠ-যক্ষা, পেটের রোগ ও জ্বর, চোখের ছানি ও চক্ষু সংক্রান্ত অন্যান্য অসুখ এবং বিভিন্ন যৌনরোগ, মহিলাদের মধ্যে অতিরিক্ত সাদাস্রাব পতন লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী ভিখারীদের সংখ্যা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উক্ত ভিখারীরা ভিক্ষা গ্রহণের জন্য শহরের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত, শহর থেকে শহরে ও গ্রামে যাতায়াত করে থাকেন এবং তাদের বিভিন্ন অসুখ-বিসুখ অন্যান্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হন।

বিভিন্ন অ-সরকারী চিকিৎসা কেন্দ্র এদের চিকিৎসা করতে রাজী থাকেন না। এছাড়া ভিখারীরা ভিক্ষা আদায় করার জন্য নোংরা পোষাক পরিচ্ছদ ও অন্যান্য কায়দা-কানুন করার জন্যও বিভিন্ন অসুখ-বিসুখ প্রাপ্ত হন। সময়ে চিকিৎসা না হওয়ার জন্য রোগীর রোগ ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়।

আমার চোখে ভিখারি

শ্রীমতী ইন্দ্রানী হাইত -সমাজকর্মী

আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীর বুকে আমরা যখন মা বাবার কোল জুড়ে ঘর আলো করে আসি তখন আমাদের সর্বপ্রথম শিশু কন্যা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তারপর আসে তাদের বংশপরিচয়, কুল পরিচয়, জাতি, ধর্ম এই সমস্ত দিক দিয়ে তাদের নামকরণ করা হয় বিভিন্ন রীতিনীতি মেনে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। সর্বোপরি আমরা মনুষ্যজাতি জীবকূলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আমরা আমাদের পরিশ্রম এবং সৎপ্রচেষ্টার মাধ্যমে জীবনে উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে এগিয়ে চলি। আমাদের সমাজে আমাদের নানা মানসিকতায় সৃষ্টি হয়েছে উচ্চশ্রেণী, মধ্যবিত্ত শ্রেণী, নিম্নবৃত্ত শ্রেণী এবং অতিনিম্নবৃত্ত শ্রেণী। এই উচ্চ শ্রেণীর মানুষের উচ্চাকাঙ্খা এবং নানা ভাবে শোষন ও নীপিড়ণের জন্য পরবর্তী শ্রেণীগুলি সৃষ্টি হয়েছে ও তারা সর্বক্ষণ মানসিক, শারীরিকভাবে নিপীড়িত ও নিষ্পেষিত হচ্ছেন। একেবারে নীচুতলার মানুষের জীবনসংগ্রামে পরাজিত হয়ে তাদের শিশু, বৃদ্ধ বাবা-মা, স্ত্রী অথবা স্বামী, ভাই-বোনদের মুখে দুটো অন্ন তুলে দিতে গিয়ে পথে নেমে পড়েছেন। সময়ের চাকা গড়িয়ে রাত্রি থেকে ভোরের আলোয় চারিদিক আলোকিত হলেও এদের জীবনে সেইভাবে আলোকপাত ঘটেনি। এই ভাবেই সমাজের বুকে সৃষ্টি হয়েছে একটি শ্রেণী ভিক্ষুক বা

ভিখারী। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় জগৎ সংসারে আমরা সকলেই কিন্তু এক-একজন ভিখারী। ঈশ্বরের কাছে আমরা সর্বদা কামনা করতে থাকি আমাদের চাওয়া-পাওয়ার ফর্দ মেলে ধরি আমাদের মনোবাসনা গুলি। যারা সত্যিই দুটি অন্নের সংস্থানের জন্য পথে নেমেছে তাদের দৃষ্টিতে ঈশ্বরের কাছে ভিক্ষা আমাদের চাওয়াটা খুবই লজ্জার বিষয়। আমরা দেখে থাকি এই ভিক্ষুক শ্রেণীটি আদিকাল থেকেই চলে আসছে, পুরাকালে ঋষিরা তাঁদের শিষ্যদের নিয়ে ভিক্ষা করতেন গ্রামে গ্রামে ঘুরে। গৃহস্থ মহিলারা তাঁদের সাধ্য মতো চাল, আলু, ফলমূল, কাঁচা টাকা দান করতেন। বিভিন্ন জাতির ভিক্ষুকরা ভিক্ষা করে থাকেন।

আমরা খুব ছোটো বেলা থেকে দেখে আসছি বাড়িতে ভিখারী এলে বাড়ির মহিলারা চাল, আলু, সব্জি এবং কাঁচা টাকা দিতেন। তখন তাদের কোনো রকম চাহিদা ছিল না, কিন্তু বর্তমানে তাদের সন্তুষ্ট করা যায় না। উল্টে মানুষ তাদের উপর প্রচন্ডভাবে বিরক্ত হন যখন দেখেন তাদের চাহিদা মতো প্রণামী মিলল না ভিখারিরা তারা অশ্রাব্য গালিগালাজও করে। দিন দিন সমাজব্যবস্থা খারাপ হবার জন্য, কলকারখানাগুলি বন্ধ হবার জন্য মানুষ আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না। ফলে ঘরে ঘরে বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। অন্ন সংস্থানের জন্য তাই কিছু মানুষ ভিক্ষা করাকেই সাময়িক মুক্তির পথ হিসেবে বেছে নিয়েছে। ভিক্ষা করতে সেই রকম কোনো পরিশ্রম করতে হয় না, তাই কেউ কেউ ভিক্ষাবৃত্তিকেই তাদের জীবিকা হিসাবে নির্বাচন করেছে।

রাস্তায় ভিখারি গ্রাম, শহর, শহরতলি, মন্দির, মসজিদ, গির্জা নির্বেশেষে সর্বক্ষেত্র আজকাল খুব বেশী করেই চোখে পড়ে। যিনি রাস্তায় প্রায়ই ভিক্ষা প্রার্থনা করেন তাদের মধ্যে কে যে দায়ে পড়ে ভিক্ষা করেন আর কে যে শারীরিক পরিশ্রমে ভীতির কারণে ভিক্ষা করেন তা বোঝা সত্যিই দুষ্কর। ভিখারীদের মূলত ভিড়ের জায়গাগুলিতে যেমন বাস স্ট্যান্ড, রেল স্টেশন, ওভারব্রিজের ওপর বসে থাকতে দেখা যায়। রাস্তায় অন্ধ, বোবা, খোঁড়া প্রতিবন্ধী ভিখারীদের দেখা যায়। শীতে, গ্রীষ্মে, বর্ষায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হতে এদের দেখা যায়। ভিক্ষাবৃত্তির ক্ষেত্রে একটি সুস্পষ্ট কারণ হল নিরক্ষরতা, দারিদ্র এবং বেকারত্ব, অনেক দুষ্ট মানুষ ভিক্ষুকদের কলঙ্কিত করছেন। অনেক দুষ্ট মানুষ ভিখারীদের প্রলোভন দেখাচ্ছেন এবং তারা লোভের বশে বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত হচ্ছে। মহিলারাও অনেক সময় মনের মানুষের সঙ্গে ঘর ছেড়ে এসে, তারপর তাদের স্বপ্ন ভঙ্গ করে যখন সেই মানুষটিই তাকে কোথাও বেচে দেয় কিছু পয়সার লোভে তখন তাকে পতিতার জীবন বেছে নিতে হয় আর বয়সকালে নোংরা আবর্জনার মতো অবাঞ্ছিত হয়ে পথে পথে ঘুরতে হয় কিছু ভিক্ষার আশায়।

আজকাল পথে, ঘাটে, ট্রেনে, বাসে সর্বত্রই তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের সঙ্গে আমাদের সংস্পর্শে আসতে হয়। যারা চলতি কথায় ''হিজড়া'' নামে পরিচিত। এদেরও নরম সুন্দর একটি মন আছে। পূর্বে বাড়িতে শিশুর আগমন হলে বলা হত এদের আশীর্বাদ খুবই ভালো। এরা শিশুকে নিয়ে নাচ, গান, করে কিছু পয়সা, কাপড় প্রভৃতি উপার্জন করত। কিন্তু বর্তমানে এদের মানুষের থেকে চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় ও মানুষের উপর জোর জুলুম করার জন্য সকলে তাদের প্রতি বিরক্ত হন। বর্তমানে তারা বাসে, ট্রেনে, রাস্তায় জোর জুলুম করে টাকা আদায় করে। তাদের মনের মতো টাকা না দিতে পারলে অশ্রাব্য গালিগালাজ, কটুকথা, অভিশাপ দিতেও পিছ পা হয় না।

অনেক ভিক্ষুকরা করুণা প্রকাশ করার মতো করুন অবস্থায় রয়েছে। এ জাতীয় পঙ্গু ভিক্ষুকরা ধর্মীয় গান গাওয়ার শিল্পে পারদর্শী হয়। এদের মধ্যে কিছু ভিক্ষুকের খুব সুর আছে বাকযন্ত্রে। আজকাল ট্রেনে বাসে, স্টেশনে রাস্তায় অনেক সময় তাদের একটি বাক্সের মধ্যে গান চালিয়ে মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে ঠোঁট মেলাতে দেখা যায় এবং তার সঙ্গের সাথীটি হাত পেতে সকলের থেকে পয়সা দেবার আবেদন করতে থাকে। অনেকে চটুল গানও গেয়ে থাকে

তাদের খালিগলাতে । অনেকের মিষ্টি মধুর কণ্ঠের যাদুতে পথচলতি পথিকের দল আকৃষ্ট হন এবং তাদের ঝুলিতে কিছুটা করুনার দান দিয়ে যান। অনেক ভিক্ষুক ট্রেনে বাসে ভক্তিমূলক গানের মাধ্যমে ভ্রমনকারীদের কিছুটা সময় মুগ্ধতার আবরণে টেকে ফেলে বাহবা কুড়ান। এই ভিক্ষুকরা মানুষের মানসিকতা জানেন এবং মানুষের অনুভূতি স্পর্শ করে ভিক্ষা করেন।

বেশিরভাগ ভিক্ষুকই নরম হৃদয়ের মানুষের উদারতার কারণে সাফল্য লাভ করে। এই ভিক্ষুকরা কখনও ধর্মীয় সমাবেশ ও উৎসগুলি থেকে নিজেদের সরায়না। কিছু ভন্ড ভিক্ষুকের দল ছাই-ভস্ম গায়ে হাতে মেখে, অল্প বস্ত্র পরিধান করে, লম্বা চুল-দাড়ি রেখে ভিক্ষাবৃত্তির আড়ালে নানা কুমতলব আঁটতে থাকে। এরা বিশেষত নারিপাচার চক্র, শিশুপাচার চক্র, শিশু বিক্রি, কিশোর কিশোরীদের বিপথে চালিত করা, অঙ্গ বেচাকেনা, গাঁজা, আফিম, ড্রাগ প্রভৃতির সঙ্গে পরোক্ষভাবে যুক্ত। এরা অনেকেই বেকারত্ব, নিরক্ষরতা, সমাজের এদের প্রতি উদাসীনতা, লোভ মানসিক বিকৃতির স্বীকার। যার ফলে এরা নিজেদের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য সমাজের উচুঁশ্রেনীর মানুষদের নিকোষিত করে চলেছে চুরি, ছিনতাই, ডাকাতির মাধ্যমে। এই ভাবে কুপথে এগিয়ে তারা যেন কড়ায় গন্ডায় বুঝে নিতে চাইছে আর উচ্চশিক্ষিত, আলোকিত, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর মানুষের আশা আকাঙ্খাকে পদদলিত করে এগিয়ে যাওয়ার তীব্র চেষ্টা করছে।

ভিক্ষুকরা অন্যের উপার্জনে বেঁচে থাকে। সুস্থ ব্যক্তিও ভিক্ষাবৃত্তির আশ্রয় নেয়, এটা এই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও খুবই লজ্জার বিষয়। ভিক্ষা করা আমাদের সমাজের জন্য উদ্বেগের কারণ। যাদের দেহ সক্ষম অথচ ভিক্ষাপাত্র হাতে ভিক্ষা করছেন তাদের দান না করার জন্য জনগনকে সচেতন করতে হবে। তবে যারা সাহায্য পাওয়ার যোগ্য তাদের যথাযথভাবে সহায়তা করা উচিত। সাবলম্বী হওয়ার জন্য তাদের যথাযথভাবে সহায়তা করা উচিত। দুর্বল, ক্ষুধার্ত ও ভুক্তভোগী মানুষের সহায়তা করা আমাদের প্রত্যকের নৈতিক কর্তব্য। আমাদের তাদের শিক্ষিত ও পুনর্বাসনে সহায়তা করা উচিত। সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থাগুলি উপযুক্ত ব্যক্তিদের সহায়তা এবং অলস ও প্রতারণাপূর্ণদের শাস্তি ও নিয়োগ দিয়ে ভিক্ষুকদের উন্নতির জন্য কাজ করছে।

রাস্তায় ভিক্ষুকরা যে কোনো সমাজের পক্ষে সত্যিই নিষিদ্ধ। আজকাল মানুষ কোনও ধর্মীয় অনুভূতির দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয় না। সুতরাং ভিক্ষুকদের প্রতি যেভাবে আচরণ করা হবে বলে আশা করা হয়। সেভাবে তাদের প্রতি আচরণ করা হয় না। এটা আমাদের সকলের খুবই বিবেচিত বিষয় যাতে আমরা আর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কোনোভাবেই ভিক্ষাবৃত্তি না করে সেই দিকে দিকপাত করি। আসুন আমরা সকলে সমাজ থেকে 'ভিক্ষুক' মানুষদের জন্য একটু ভেবে দেখি তাদের জন্য নিজের সাধ্যমত কিছু করার অঙ্গীকারবদ্ধ হই।

ভিক্ষুক তুমি কার

শ্রী আদিত্য

আমরা যাদেরকে ভিক্ষুক বলে জানি বা মানি তারা অনেকেই হয়তো ভিক্ষুক নয়। আমাদের সমাজ তাদেরকে ভিক্ষুক তকমা দিয়ে থাকে। তাদের অনেকেরই অর্থ-সম্পত্তি, জমি-জমা থাকা সত্ত্বেও, কিছু অর্থলোভী, পেশী বহুল মানুষ এবং কিছু অসাধু প্রমোটার রাজের বদান্যতার ফলে অনেকেই নিঃস্ব তাই তারা আজ ভিক্ষুক, পথে পথে ঘুরে বেড়ায়-একমুঠো অন্নের জন্য।

এ শুধু একা নয়, এরকম কত শত মানুষ আছে তারা মানুষের চোখে ভিক্ষুক মানে প্রতীকি ঘৃণার। কিন্তু তারা জানেনা তারাও (ভিক্ষুক যাদের বলছে) হয়তো ছিলো সমাজের কোন প্রতিষ্ঠিত নাগরিক। একটি কাল্পনিক চরিত্রের মধ্যে তাদের অবস্থা বর্তমান পরিস্থিতিতে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে—

খাঁ খাঁ রোদ্দুরে, প্রচন্ড দাবদাহের
মধ্যে বসে থাকা এক ভিক্ষুক
তার ক্ষুধার্ত চোখ দুটি নিয়ে
তাকিয়ে থাকে রাস্তার ধারের
ঐ ডাস্টবিনটার দিকে।

কয়েকজন মানুষ নিত্য দিন ফেলে
যায় শহরের উচ্ছিষ্ট খাবারের
জঞ্জাল, তার থেকে সে খুঁজে নেয়
ক্ষুধা নিবৃত্তির অমৃত কণা, মুখে
তুলে দেবে বলে তার শিশুটিকে

একদিন তারা আসেনা উচ্ছিষ্ট খাবারের
জঞ্জাল ফেলার জন্য। ভিক্ষুক কিন্তু সারাদিন
অপেক্ষা করে থাকে, আর্ত ক্ষুধার্ত চোখ
দুটি নিয়ে তাকিয়ে থাকে ডাস্টবিনের
দিকে, যদি তারা হেতা আসে কভু।
দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা নামতে চায়—
তখন সে তাকিয়ে থাকে অসহায়-
ভাবে সেই ডাস্টবিনের দিকে, ফিরতে
চায় না মন, ক্ষুধার্ত শিশুটার কাছে তবু

সে তো ছিলো ভিক্ষুক আজকের মতো
চায়নি সে অন্যের কাছে হাত পাততে
সেও বাঁচতে চেয়েছিলো আর পাঁচজনের
মতো সমাজের কাছে-মাথা উচুঁ করে

নয়নের বারি-পাতে ভেসে উঠে তার শৈশব
শিক্ষার আলো-আঁধারীতে কাটানো জীবন
দুষ্টুমির আঁচলে বাঁধা শিশু সুলভ আচরণ
আর আজ ব্যথিত হৃদয় শুধু গুমরে কেঁদে মরে

কখনও কখনও উদাস মনে ভাবতে থাকে—
সেই আকাশ, সেই বাতাস, জোছনা ভরা—
রাতে চেনা অচেনা পথ, সবই আছে ঠিক
আগের মতো, শুধু আমি নেই সেদিনের—
মতো আজ

দূর থেকে ভেসে আসা মায়াবী রুটির
গন্ধ বাবুদের ঐ গরাদের পাশ থেকে
হয়তো আমারই মতো কেউ বড় আশা।

আপনার সাহায্য প্রার্থনীয়।

আপনার আর্থিক সাহায্য 80G ধারায় আয়কর ছাড়যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

PEOPLE'S PARTICIPATION

Email - peoplesparticipation@gmail.com, **Mob. : 9339126219**

ভিখারী দর্শন

PEOPLE'S PARTICIPATION
PP
another world is possible
2005
another world is possible